ভেঙে যাওয়ার পরে

জয় গোস্বামী

একশো নিরানব্বই দিন হল আজ। তার মানে ছ'মাস উনিশ দিন। অখিলেশ একটা একটা করে দিন গুনে চলেছেন। সপ্তাহের হিসেব রাখছেন না। মাসের হিসেবও নয়। একেবারে দিনের হিসেব রাখছেন। খুব যে স্বেচ্ছায় রাখছেন এইরকম হিসেব— তা-ও নয়। বরং স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অখিলেশের মনে এই দিন গোনার কাজটা চলেছে। বলা দরকার, খুব চেষ্টা করেও এই দিন গোনার অভ্যেসটা ছাড়তে পারছেন না অখিলেশ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ে যায়, গত প্রায় সাত মাস ধরেই মনে পড়ে গিয়েছে, ধরা যাক, আজ একাশি দিন হল... অথবা আজ একশো পাঁচ দিন হল... কিংবা

আজ হল একশো তেতাল্লিশতম দিন...

এই দিনগুলি দেখা না হওয়ার দিন। দেখা হয়নি কতদিন, এগুলো তার হিসেব। এ-ও ভাল করে জানেন অখিলেশ, দেখা আর হবে না কোনওদিন। তবু সকালে উঠেই মনে হয়, এখন কী করছে ও? স্নান করে এসে তৈরি হচ্ছে বেরোনার জন্য? তার কিছুক্ষণ পর মনে হয়, এখন নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে? কীভাবে যাচ্ছে? বাস ধরেছে কি? ও যখন বেরোয়, তখন অফিসের ভিড়টা শুরু হচ্ছে। বেশির ভাগ সময়েই ও বাসের ঝক্কি নিতে চাইত না। বাড়ি থেকেই একটা উবর ডেকে নিত। আজও কি উবর নিয়েছে? তারও কিছুক্ষণ পর অখিলেশের মনে হয়, এখন ও নিশ্চয়ই ডিপার্টমেন্টে পৌঁছেছে। এবার কি ক্লাস নিতে গেল? দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে একবার ফোন আসত ওর। নিয়ম করে আসত ফোনটা। সকাল এগারোটাতেও আসত এক-একদিন। ফোনে ওর নাম ভেসে উঠত। অনেকবারই এমন হয়েছে, অখিলেশ ওই সময়টাতেই স্নান করতে ঢুকেছেন। স্নান করে বেরিয়ে দেখেছেন, ওর নামে মিসড কল হয়ে আছে। পালটা ফোন করেছেন অখিলেশ। ওদিক থেকে প্রথম যে-প্রশ্নটি আসত তা হল, "শরীর কেমন?" অখিলেশের স্বাস্থ্য ভাল যায় না, প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই উদ্বেগে ভরা কণ্ঠস্বরে এই প্রশ্নটি প্রথমেই আসত। আর-একবার ফোন আসত বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। তখন ওর বাড়ি ফেরার পালা। উবর ধরে যেতে যেতে ফোনে কথা হত। তখন অখিলেশও গাড়িতে। অফিস যাচ্ছেন। অখিলেশের অফিস বিকেলে। কোনও-কোনও দিন দুপুর সাড়ে বারোটার ফোন বলত, "আজকে বিকেলে আপনার কী কাজ?" যত কাজই থাক, অখিলেশ বলতেন, "কোনও কাজ নেই।" ফোন বলত, "তা হলে আজকে আসব?" অখিলেশ উত্তর দিতেন, "আসুন।"

উত্তরটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অখিলেশের শ্বাস-প্রশ্বাসে ঢুকে পড়ত এক গভীর আনন্দের বাতাস। তখন মোটেই দিন গুনতেন না অখিলেশ দেখা করার জন্য। তিন-চারদিনের মধ্যে একবার দেখা হতই। কখনও পরপর দু'দিন। দিনে বেশ কয়েকবার ওর ফোন আসত তখন। বিকেলে তো আসতই ফোন, ও নিজে না আসতে পারলে। সন্ধেবেলাও আসত ফোন, সন্ধের পরেও, রাত্রেও। কখনও কখনও ফোন প্রথম প্রশ্নটাই করত, "ব্যস্ত বুঝি?" এটা হত বিকেলের ফোনে। অখিলেশ হয়তো বললেন, "একটা মিটিংয়ে বসছি। এখন ঘণ্টা দুয়েক আমাকে পাবেন না। আমার ফোন সাইলেন্ট থাকবে।"

মিটিং থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে ফোন চেক করতে গিয়ে অখিলেশ দেখলেন সাতটা মিসড কল। তার মধ্যে পাঁচটাই ওর। তাজ্জব ব্যাপার! বলে দিলাম মিটিংয়ে থাকব, ফোন সাইলেন্ট করে দিচ্ছি। তারপরেও পাঁচটা মিসড কল? কী ঘটল? সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন অখিলেশ। ও বলল, "জানি তো আপনার ফোন সাইলেন্ট, জানি তো আপনি ধরবেন না, তবু রিং করলাম, এমনি রিং করলাম।" অখিলেশ অবাক, "সে কী? কেন?" উত্তর এল, "আপনার নম্বর ডায়াল করলে যখন রিং বাজতে থাকে, ওটা শুনেই আমার একটা আনন্দ হয়। তাই আপনার ফোন বাজালাম কয়েকবার। রাগ করলেন?"

"রাগ?" অখিলেশ সেদিন এই উত্তর শুনে ভেবেছিলেন, এত প্রাপ্তিও আমার ভাগ্যে আছে? কখনও কল্পনা করিনি। মুখে বলেছিলেন, "এ কী পাগলামি? এরকম কেউ করে নাকি?" ও বলেছিল, "কেন করব না? আমি জানি তো, ওটা বিশেষ একজনের ফোন। আপনার ফোন। ওটা তো আপনারই জহরকোটের পকেটে রয়েছে। ওখান থেকেই বাজছে। আপনি না ধরলেও এককরমভাবে তো আপনার সাড়া পাচ্ছি। তাই রিং করে গেলাম।"

সেদিন কোনও জবাব দিতে পারেননি অখিলেশ।

আর এখন বেলা যতই বাড়ে অখিলেশের মনে এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে, কী করছে ও? যদি ক্লাস থাকে তবে নিশ্চয়ই ক্লাস নিচ্ছে। যদি তখন থাকে তা হলে নিশ্চয়ই ওর নিজের চেয়ারে বসে আছে ওদের ডিপার্টমেন্টে। বড় টেবিলটায় হয়তো ল্যাপটপ খুলে কোনও কাজ করছে। সাধারণত তিনটে পঞ্চাশ পর্যন্ত ওর ক্লাস থাকে। অখিলেশ তিনটে পঞ্চাশের আগে ওকে নিজে থেকে ফোন করতেন না। শুধু মিসড কল দেখলে রিং ব্যাক করতেন। নইলে অখিলেশের ফোন যেত তিনটে পঞ্চাশের পরে। বেশির ভাগ দিন ওরই ফোন আসত। আর যেটা সবচেয়ে বড় কথা, একটা ফোন করেই ও চলে আসত অখিলেশের বাড়িতে। এমনও অনেকবার হয়েছে, অখিলেশ বাড়ির বাইরে, ও এসে বসে রয়েছে আর ফোন করছে। ওর ফোন পেলে অখিলেশ যেখানেই থাকুন, রওনা দিতেন বাড়ির পথে। অখিলেশের পৌঁছতে তত দেরিই হোক, দেখা না করে যেত না ও।

অখিলেশ ভাবেন, এখন বিকেল তিনটে পঞ্চাশের ক্লাস শেষ হলে ও কাকে ফোন করে? ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে কার কাছে যায়? হয়তো হঠাৎ ফোন করে ও একটা কথা বলত অখিলেশকে, "রাগ করছেন? বলুন না, রাগ করেছেন?" অখিলেশ ভেবেই পেতেন না এই প্রশ্ন কেন করা হচ্ছে। রাগ করার তো কোনও কারণই ঘটেনি। মেসেজও আসত ঘন ঘন, "আমার উপর রাগ করেননি তো?" পরে অখিলেশ বুঝেছিলেন, এইরকম অকারণে রাগের ভয় পাওয়াটা ওর স্বভাব। সেই স্বভাববশেই মনে মনে কিছু একটা ভেবে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা করে। অখিলেশ প্রাণপণ যোঝাতে চেষ্টা করতেন, তিনি মোটেই রাগ করেননি। তা ছাড়া সত্যি কথা বলতে, ওর উপর রাগ করার কথা, বিরক্ত হওয়ার কথা অখিলেশ কল্পনাও করতে পারতেন না। ওর উপর রাগ করা অসম্ভব ছিল অখিলেশের পক্ষে। অখিলেশের মনে যেখানে ওর অবস্থান, সেখানে 'রাগ' জিনিসটা নেই, ছিল না।

অখিলেশ ভাবেন, এখন ও কাকে বলে, "রাগ করেছেন?" কাকে মেসেজ করে, "আজকে আসব? বিকেলে আছেন?"

অখিলেশ জানেন, বিকেল তিনটে পঞ্চাশের পর ও এখন কাকে ফোন করে, কার কাছে যায়, কাকে মেসেজ করে, জানেন। অখিলেশের ভিতরটা পুড়ে যায়। পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়। অখিলেশ গুনতে থাকেন আজকে একশো সাতাশ দিন হল, আজকে একশো পঁচাশি দিন হল। যেমন গুনেছেন আজ একশো নিরানব্বইতম দিন। দেখা না হওয়ার একশো নিরানব্বইতম দিন।

দুই

যখনই ও আসত বাড়িটা যেন আলো হয়ে উঠত। অন্তত অখিলেশের কাছে। হাসলে ভারী সুন্দর দেখায় ওকে। ওর হাসি ছিল প্রাণখোলা। কথায় কথায় হেসে উঠতে পারত ও। আর তখন বাড়ির চেহারাই যেন বদলে যেত। অখিলেশের কাছে ও ছিল আলোকদূতি। অথচ প্রথম যেদিন অখিলেশ ওকে দেখেছিলেন তখন কিন্তু ওকে এমন আলোকোজ্জ্বল দেখায়নি। বরং অনেক ম্লান লেগেছিল ওকে। তার আগে বলতে হয় কীভাবে যোগাযোগটা হল প্রথম। কিন্তু সেসব বলার কি দরকার আছে কোনও? এসব ঘটে, ঘটে যায়। বিধাতা বা নিয়তিই দু'জন নারী আর পুরুষকে কাছাকাছি টেনে আনেন, সম্পর্কে গেঁথে দেন। এখানেও তাই হল। ও অখিলেশের লেখা পড়ে ফোন করেছিল প্রথমে। তারপর মাঝে মাঝেই ফোনে কথা হত। একসময় অখিলেশও ফোন করতে শুরু করলেন। তারপর একদিন অখিলেশই আসতে বললেন বাড়িতে। এককথায় সম্মত হল ও।

প্রথম দেখার দিনটি এখনও স্পষ্ট মনে আছে অখিলেশের। অখিলেশ থাকেন যাদবপুরে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ঠিক উলটোদিকে যে-লম্বা রাস্তাটা চলে গিয়েছে, যাকে 'বেঙ্গল ল্যাম্প' বলা হয়, সে রাস্তাটা দিয়ে সোজা এগিয়ে আসতে হবে। বাঁদিকে বড় একটা পুকুর পড়বে। পুকুরটাকে শেষ করে, রাস্তাটা বাঁদিকে ঘুরে গিয়েছে— এবার কয়েকটা দোকানঘর, তারপর বাঁদিকেই ছোট্ট ছোট্ট দুটো গলি ছেড়ে দিতে হবে— এরপর একটা মুদিখানার দোকান। দোকানটি পার হয়ে এগোলেই বাঁদিকে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা গলি। ওই গলির তৃতীয় বাড়ির একতলায় বেল বাজাতে হবে। বাড়িটাও গলির বাঁদিকে। যাদবপুর

ইউনিভার্সিটির চার নম্বর গেটের মুখ থেকে হেঁটে এলে সব মিলিয়ে মিনিট পাঁচেকের পথ।

এইভাবেই প্রথম দিন পথনির্দেশ দিয়েছিলেন অখিলেশ। বিশেষভাবে বলেছিলেন, "পুকুরটা পার হয়ে দোকানঘরগুলির সামনে এসে গেলেই আমাকে মোবাইলে ফোন করতে থাকবেন। আমি গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াব। তা হলে আর আপনার রাস্তা ভুল হবে না। পরপর তিনটে গলি তো, তাই গুলিয়ে যেতে পারে। আমি আপনার ফোন পেলেই এসে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি সোজা হেঁটে এলেই একসময় আমাকে দেখতে পাবেন।"

ওর ফোন পাওয়া মাত্রই অখিলেশ দ্রুত পায়ে গলির মুখে চলে গিয়েছিলেন। ফোন কানে নিয়েই বলে যাচ্ছিলেন, "সোজা এগিয়ে আসুন, কোনও বাঁক নেবেন না, সোজা আসুন..." এরকম বলতে বলতেই অখিলেশ দেখতে পেয়েছিলেন ওকে। সেটা ছিল এক দম মাস। দারুণ গ্রীষ্মের প্রায় পড়ে আসা বিকেল। অখিলেশের সাদা পাঞ্জাবি-পাঞ্জাবি পরা চেহারাটা দেখে ওর কী মনে হয়েছিল, সে কথা কখনও জিজ্ঞাসা করেননি অখিলেশ। সত্যি বলতে, এমন কিছু জানতে চাওয়ার কথা কখনও মনেই হয়নি অখিলেশের। কিন্তু অখিলেশের স্পষ্ট মনে আছে ওকে প্রথম দেখার অভিজ্ঞতাটি।

দোকানঘরের পাশ থেকে বেরিয়ে এল সালোয়ার কামিজ পরা একটি মেয়ে। দুই কাঁধে দু'টি ভারী ব্যাগ। পরে শুনেছিলেন তাতে বই আছে। গ্রীষ্মের প্রবল তাপ নিশ্চয়ই তার মুখে পড়েছে অনেকক্ষণ। ফরসা রং পুড়ে কালচে একটা ছাপ ফেলেছে মুখে। তা ছাড়া মুখে এমনিতেই একটা ম্লানতা। উজ্জ্বলতার কোনও চিহ্ন মুখে নেই। দু'-চারটি উড়ো চুল ঘামের সঙ্গে কপালে আটকে আছে। দোহারা চেহারা, দীর্ঘাঙ্গী। অখিলেশরা একতলায় ভাড়া থাকেন। বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। "রাস্তা চিনে আসতে কষ্ট হয়নি তো?" অখিলেশ কথা শুরু করলেন। প্রথম দিন বেশি কথা বলেনি ও। চোখে পড়ার মতো ছিল ওর মুখের ক্লান্তি আর বিষাদছাপ।

কেন সেই বিষাদছাপ, সে কথা অনেক পরে জানবার সুযোগ হয়েছিল অখিলেশের। প্রথম দিন ও বসে থাকার সময় একটা ফোন আসে অখিলেশের কাছে। ফোনে অখিলেশ কথায় কথায় জানান একটি বিশেষ বই তাঁর দরকার, কিন্তু কিছুতেই আর কলেজ স্ট্রিটে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারেননি অখিলেশ। কী যে করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না।

ফোনে কথা শেষ হওয়ার পর ও বলল, "কী বই দরকার আমাকে নাম লিখে দিন, আমাকে প্রায়ই কলেজ স্ট্রিট যেতে হয়, আমি এনে দেব।"

অখিলেশ সংকোচ প্রকাশ করেন, "আপনি আনবেন কেন কষ্ট করে?"

ও বলল, "কিছু কষ্ট হবে না। আমাকে বইয়ের নাম আর লেখকের নাম বলুন, আমি এনে দিচ্ছি। কবে দরকার আপনার?"

অখিলেশের দ্বিধা তবু যায় না। বলেন, "না থাক, দেখি কী করা যায়!"

হঠাৎ ও বলল, "যদি বলি বইটা এনে দিতে পারলে আমার ভাল লাগবে, কিছু কষ্ট হবে না— তা-ও বলবেন না বইয়ের নাম?"

চোখ দুটো তুলে ওমনভাবে বলল, চোখের মধ্যে যেন কী একটি ছিল। কপালে চুলের গুছি আটকে আছে, ঘামে তেলতেলে মুখ, তবু যেন কোথাও আলো জ্বলে উঠল অখিলেশের ভিতরে। অখিলেশ বইয়ের নাম, কে লেখক, কোন প্রকাশনা— সব বলে দিলেন। দু'দিন পর তিনদিনের দিন ও বই হাতে হাজির। কিন্তু কিছুতেই দাম নেবে না। নিলও না শেষ পর্যন্ত। অনেক জোর করার পরে বলল, "একটা বইও কি আমি আপনাকে দিতে পারি না?"

সপ্তাহ দুয়েক পার হয়েছে, হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা ফোন। ওপারে ও, "আপনার কি কোনও বই দরকার আছে?"

অখিলেশ অবাক। বললেন, "হঠাৎ এ প্রশ্ন?"

উত্তর এল, "না, আমি কলেজ স্ট্রিটে এসেছি, বই কিনতেই এসেছি। যদি আপনার কোনও বই দরকার হয়, তাই ফোন করলাম।"

অখিলেশ বলেন, "না, কোনও বই দরকার নেই।"

এবার প্রশ্ন এল, "আপনি কি আজ বিকেলে বাড়ি থাকবেন?"

অখিলেশ বলেন, "না, আমি তো অফিসে আছি।"

উত্তর এল, "কলেজ স্ট্রিট থেকে আপনার অফিস তো একটুখানি। আমি কি একবার যেতে পারি?"

"হ্যাঁ, চলে আসুন," অখিলেশ জানান।

বিকেলে এল। ব্যাগ থেকে দুটো বই বার করে অখিলেশের টেবিলে রাখল। দুটো কবিতার বই। দুটোই অখিলেশের লেখা। বলল, "সই করে দিন।"

অখিলেশ বিস্মিত, "আগে বলেননি কেন? আমিই আপনাকে দিতাম। মিছিমিছি কিনলেন!"

এবারের উত্তরে অখিলেশের আকাশ থেকে পড়ার পালা, "এই বই দুটোই আমার আছে। আবার কিনলাম। কিনতে ভাল লাগল বলে। আপনার বই দোকানে সাজানো আছে দেখলেই আমার ভাল লাগে। মনে হয় বাড়িতে আছে তো কী হয়েছে, আর-একবার কিনি। দিন, সই করে দিন।"

অখিলেশ আবার নিজের ভিতরে সেই আলো জ্বলে উঠতে দেখলেন।

দিন যায়, দিন যায়। অখিলেশ নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ওদিক থেকেও কোনও সাড়া-শব্দ নেই। একদিন দুপুরে আবার ফোন, "আপনি কিন্তু অনেকদিন আমাকে কোনও বই আনতে দেননি? আপনি কি আমার উপর রাগ করছেন?"

অখিলেশ ওকে প্রাণপণ বোঝাতে চেষ্টা করেন তিনি রাগ করবেন কেন? তেমন তো কোনও কারণ ঘটেনি। ও নাছোড়, "তা হলে আপনি কেন বই আনতে দিচ্ছেন না? বলুন না বাবা একটা-দুটো বইয়ের নাম।"

অখিলেশ বলেন, "কোনও বইয়ের নাম তো আমার মনে পড়ছে না!"

ফোন বলল, "আপনাকে একদিন বলেছি না আপনার জন্য বই কিনতে আমার ভাল লাগে। সেই ভাললাগাটুকু আপনি আমাকে দেবেন না কেন?"

অখিলেশ কেমন যেন অসাড় হয়ে গেলেন এই কথা শুনে। যন্ত্রবৎ বলে চললেন, "বইয়ের নাম অন্নপূর্ণা, লেখকের নাম স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।"

উলটোদিকের কণ্ঠস্বর চঞ্চল হয়ে উঠল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান। লিখে নিই। আপনি আর-একবার বলুন প্লিজ নাম দুটো!"

অখিলেশ বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথায়? আজকেও কি কলেজ স্ট্রিটে?"

"না, আমি ডিপার্টমেন্টে। কলেজ স্ট্রিট যাব বলে বেরোচ্ছি। তাই ফোন করলাম। আচ্ছা রাখছি।"

বিজ্ঞান পড়ায়, কলকাতারই কোনও একটি কলেজে। সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক। কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেছেন অখিলেশ, "আপনি নিজে কিছু লেখেন?" প্রতিবারই শুনেছেন, "না, না। কিছু লিখব, সেই শক্তি কি আমার আছে? তাই তো আপনাদের লেখা পড়ি।"

সেইদিন হঠাৎ রাত্তিরে ফোন, "বইটা কি একটা দিন আমার কাছে রাখব? এই অন্নপূর্ণা? তা হলে একবার পড়ে নিতাম। সংগীতশিল্পীর জীবনী তো! তাই খুব হিজে করছে পড়তে।"

অখিলেশ বলেন, "একদিন কেন! একমাস রাখুন না। পড়ে নিন ভাল করে। তারপর আমাকে দেবেন।"

"না, অতদিন লাগবে না। ছোট বই। একদিন পর আমি গিয়ে আপনাকে দিয়ে আসব।"

দিতে যেদিন এল, সেদিন অফিসে নয়, বাড়িতে এল। সঙ্গে অখিলেশের লেখা আরও দু'টি কবিতার বই।

"সই করে দিন।"

অখিলেশ বলেন, "আবার কিনলেন? আমাকে জানালেই তো আমি

দিতাম!"

উত্তর এল, "হ্যাঁ, দিতেন। জানি তো। কিন্তু আপনার বই কিনতে আমার আলাদা একটা আনন্দ হয়। সে আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন কেন? এই নিন আপনার অন্নপূর্ণা।"

এখন রাত্রি। কাচ ঢাকা বইয়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে আছেন অখিলেশ। অন্নপূর্ণা বইটি অখিলেশ আলমারিতে আলাদাভাবে ডিসপ্লে করে রেখেছিলেন। সুরযন্ত্র হাতে অন্নপূর্ণা দেবীর ছবিটি দেখা যাচ্ছে দাঁড় করিয়ে রাখা বইটির প্রচ্ছদে। ন'বছর হয়ে গেল বইটি এসেছে অখিলেশের বাড়ি। বইটিকে এখনও, এই মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছেন অখিলেশ। বইটি হাতে করে যে-মেয়েটি এনে দিয়েছিল, তাকে অখিলেশ দ্যাখেননি দু'শো চারদিন। কত কত বই যে সে এনে দিয়েছিল। সবই আছে। বইগুলিকে দেখা যায়। কিন্তু তাকে আর দেখা যায় না। একটার পর একটা দিন চলে যাবে। সে আর দেখা করতে আসবে না কখনও।

তিন

অখিলেশ কীভাবে আর কবে যে ওর সঙ্গে অতখানি জড়িয়ে পড়েছিলেন, সে কথা আজ আর মনে নেমে করতে পারেন না। জড়িয়ে পড়েছিলেন বলাটা ভুল হবে। এখনও প্রবলভাবেই জড়িয়ে আছেন। ও বাঁধন ছিঁড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু অখিলেশ সেই বন্ধনে এখনও আবদ্ধ। টুকরো টুকরো স্মৃতি অখিলেশের মনে ভাঙা কাচের মতো বিঁধে আছে। যেমন, একদিন ও বসে আছে অখিলেশের সামনের সোফায়, অখিলেশ দাঁড়িয়ে। কী যেন একটা বললেন অখিলেশ। ও হেসে উঠল। ঠিক কী বলেছিলেন তা আজ আর মনে নেই অখিলেশের। কিন্তু হাসিটুকু থেকে গিয়েছে। চশমার পিছনে টানা টানা চোখ, হালকা কাজলের রেখা, আঁখিতারা দু'টি উজ্জ্বলতায় ভরা। ও হাসলে আঁখিতারা দু'টি একেবারে ঝকঝক করে। অতুলপ্রসাদের গানে অখিলেশ সেই বালক বয়স থেকেই শুনেছেন, 'চাঁদিনি রাতে কে গো আসিলে/ উজল নয়নে কে গো হাসিলে—' এই 'উজল নয়ন' কাকে বলে সে কথা অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করলেন এতদিন পরে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর রেকর্ডে কবেই তো শুনেছেন এই গান, "উজল কাজল দু'টি নয়নতারা।" শুনেছেন, কিন্তু তার সাক্ষাৎ প্রমাণ অখিলেশের জীবনে এসে দাঁড়িয়াছে অখিলেশ পুরো যৌবন পার হয়ে আসার পর। কখনও কখনও ও শুধু চোখেই হাসত। আজও এই ঘরে সেসব হাসির গুচ্ছ রয়ে গিয়েছে যেন। অখিলেশ চোখ বন্ধ করলেই ওর হাসি দেখতে পান। চোখ বন্ধ না করলেও তারা দেখা দেয় যখন-তখন। সেসব সময়ে অখিলেশের মনের ভিতরে বিঁধে থাকা কাচের টুকরোগুলো নড়াচড়া করে ওঠে। আবার শ্বাসরুদ্ধ করা যন্ত্রণাটা শুরু হয়। একটা কালো ঢেউ যেন বুকের ভিতরে ঢুকে পড়ে। দম নিতে পারেন না অখিলেশ। যন্ত্রণাটা নিয়ম করে শুরু হয় ওর কোন করার সময়গুলোয়। ওর নিজের আসার সময়টা ছিল শেষ দুপুর— যখন বিকেল শুরু হচ্ছে। বেদিন শেষ ক্লাসটা অফ থাকত, তিনটের মধ্যেই ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ত ও। আবার কখনও কখনও সব ক্লাস নিয়ে সন্ধের মুখেও চলে আসত। তিন-চারদিন অন্তর একবার দেখা হতই। এক-একদিন ফোন করে বলত, "আপনি আমাকে আসতে বলছেন না যে বড়? এক সপ্তাহ হতে চলল আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি।" অখিলেশ কোনও উত্তর দিতে পারতেন না, শুধু অখিলেশের ভিতরে কোথাও একটা আগুন জ্বলে উঠত।

ও যখন প্রথম অখিলেশের বাড়িতে আসে, প্রথম যখন মুখোমুখি দু'জনের দেখা হয় তখন অখিলেশের চুয়ায় আর ওর তিরিশ। আকাশের কোথাও একটুকরো মেঘও ছিল না, কোথাও কোনও বিদ্যুৎ চমকায়নি। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক হওয়ার কোনও সম্ভাবনা কোথাও ছিল না। একজন ঘোর সংসারী ও প্রৌঢ় লেখক, অন্যজন তরুণী।

তবু কোথাও যেন জ্বলে উঠল একটা স্ফুলিঙ্গ। সম্পর্ক হল। কেমন করে? সে কথা কেউ বলতে পারে না।

সন্ধেবেলা একটা ছোট বাটি করে সামান্য গোলমরিচ ছড়িয়ে চামচ দিয়ে চিঁড়েভাজা খাচ্ছেন অখিলেশ বাইরের ঘরে বসে। পাশে ও। ঘরে আর কেউ নেই। ওর হাতেও একটা বাটি, তাতে চিঁড়েভাজা। সামনে চা রাখা আছে দু'কাপ। হঠাৎ ও হাত পাতল অখিলেশের সামনে।

"একঠা চামচ দিন আমাকে।"

অখিলেশ অবাক, "মানে?"

"আমারটা তো শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনার থেকে একটু দিন। দি-ই-ন," বলে পর্ণা চোখে তাকাল।

ওই 'দি-ই-ন' বলাটা, ওই পর্ণা চোখে তাকিয়ে থাকাটাই সম্পর্ক বা স্ফুলিঙ্গ। আলাদা করে কেউ কাউকে বাড়তি কিছু বলছে না। বিশেষভাবে বলছে না। কিন্তু ওর মধ্যেই যে-বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটার, তা ঘটে যাচ্ছে।

একদিন দুপুরে বাড়িতে কেউ নেই। অখিলেশ একা। খেতে বসেছেন। বেল বাজল। দরজা খুলে অখিলেশ দ্যাখেন ও। সাদা সালোয়ার কামিজ, সাদা ওড়না। রৌদ্রতাপে মুখ রাঙা। ঢুকেই বলল, "খাচ্ছেন বুঝিং দাঁড়ান।" বলেই সটান রান্নাঘরে ঢুকে একটা বড় সাদা প্লেট নিয়ে এল। চেয়ার টেনে বসে পড়ল অখিলেশের খাবার টেবিলের পাশে।

"দি-ই-ন।"

অখিলেশ অবাক অবাক। উঠে পড়লেন টেবিল থেকে। বললেন, "হাতটা ধুয়ে আপনাকে বেড়ে দিচ্ছি। ভাত আছে, তরকারিও আছে, ডাল, মাছ... দিচ্ছি," বলতে বলতে অখিলেশ বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, হাত ধোবেন।

তৎক্ষণাৎ পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে ও। "চলুন, হাত ধোওয়ার দরকার নেই, আপনার থালা থেকেই খাব। চ-লু-ন।"

অখিলেশ হতবুদ্ধি হয়ে টেবিলে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। শেষ চেষ্টা করলেন, "কিন্তু এটা তো এঁটো, আমি তো খাচ্ছিলাম। এখান থেকে আপনাকে দিই কী করে?"

"হোক এঁটো, আমি জানি না। আমি ওটা থেকেই খাব। বলেই সাদা প্লেট এগিয়ে ধরল। দি-ই-ন। দিন বলছি-ই।"

সাদা সালোয়ার কামিজ, সাদা ওড়না, সাদা প্লেট। অখিলেশ মন্ত্রচালিতের মতো দু'মুঠো মাখা ভাত ওর বাড়িয়ে ধরা প্লেটে তুলে দিলেন। ও শান্ত হয়ে ওটুকুই খেতে লাগল।

ওর ব্যাগে সবসময়েই থাকত রবীন্দ্রনাথের কোনও বই। সাধারণত খুব ছোট কোনও বই যা বিশ্বভারতী থেকে বেরিয়েছে, এমন বই-ই ও ব্যাগে রাখত। যেমন, 'চারিত্রপূজা', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' অথবা 'প্রান্তিক'। বলেছিল, "রচনাবলি আছে বাড়িতে, কিন্তু সে তো আর সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় না। তাই বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ থেকে ছোট ছোট বই এক কপি করে কিনে নিই।" অখিলেশ ওর পঠনরুচি দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন। গ্রীয়ের এক ভরদুপুরে বইয়ের দোকানের ঘুমন্ত কর্মীকে জাগিয়ে এক কপি 'প্রান্তিক' কিনতে চাইল ও। কিন্তু ওর কাছে পাঁচশো টাকার নোট। কর্মীটি ভাঙিয়ে দিতে পারবে না। শেষে নিকটস্থ রেস্তরাঁয় ঢুকে সামান্য কিছু খেয়ে নোট ভাঙিয়ে বই কিনল ও। বিকেলে সব বিবরণ শুনে অখিলেশ বললেন, "'প্রান্তিক' তো আগের দিন দেখলাম আপনার কাছে। আবার এক কপি কেনার জন্য এত কষ্ট করলেন?"

ও বলল, "এটা আপনার জন্যে। আগের দিন আপনি আমার হাত থেকে বইটি নিয়ে যেভাবে একটা একটা করে পাতা উলটে কবিতাগুলি পড়ছিলেন, সেই দিনই বইটি আপনাকে দিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ওই কপিটায় তো আমার নাম লেখা আছে, তাই দিতে পারিনি। আজ এটা নিয়ে এলাম। নিন।"

অখিলেশ বলেন, "আমার তো কবিতাসমগ্রই আছে। আবার এটা নেব কেন?"

"আমি এনেছি, তাই নেবেন। নিন। নি-ই-ন।"

'প্রান্তিক'-এর সেই কপিটি বহুমূল্য রত্নের মতো যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন অখিলেশ। কতদিন শুধু বইয়ের মলাটটির দিকেই তাকিয়ে থেকেছেন একান্তে নিজের লেখার টেবিলে বসে।

মলাটটা দেখলেই মনে পড়ত, ও দিয়েছে। ও। কী এক অপূর্ব আনন্দে যে ভরে উঠত মন!

'রবীন্দ্রনাথ অনেকান্ত' নামে একটি বই পড়ে মুগ্ধ হলেন অখিলেশ। বইটি লিখেছেন সুধীর চক্রবর্তী। ওই বই থেকে অখিলেশ জানতে পারলেন আরও একটি বইয়ের খবর। যে-বইয়ের নাম 'গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ', লেখক সমীর সেনগুপ্ত। বইটি সঙ্গে সঙ্গে কিনলেন অখিলেশ। রবীন্দ্রনাথের শতাধিক গানের পশ্চাদপট সে বইয়ে বিবৃত। অসম্ভব পরিশ্রমে এক-একটি গানের পিছনের বৃত্তান্ত অন্বেষণ করে এনে লিখে দিয়েছেন লেখক। কতখানি অধ্যবসায় ও মনোনিবেশ এবং যত্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভেবে অখিলেশ অভিভূত। ও যখনই এল, ওর হাতে বইটি ধরিয়ে দিয়ে বললেন অখিলেশ, "আপনি তো রবীন্দ্রনাথকে খুব ভালবাসেন, রবীন্দ্রনাথের গানকেও ভালবাসেন—এই বইটা পড়ে দেখুন। খুব ভাল লাগবে।"

কিছুদিন পর ও এসে বই ফেরত দিল। কিন্তু কোনও মন্তব্য করল না। অখিলেশ নিজেই জানতে চাইলেন, "কী? কেমন বই? ভাল না?"

ও একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ, ভাল। তবে আপনি এই বইটি আমাকে পড়তে দিলেন কেন? এ বই না পড়লে কী ক্ষতি হত আমার?"

অখিলেশ কিছুই বুঝতে পারেন না। বলেন, "না পড়লে... ক্ষতি? মানে?"

ও এবার কুণ্ঠার সঙ্গে বলে, "না না— বইটি খুবই গবেষণা করে লেখা সে কথা মানছি। তবে এই গানগুলি তো সবই আমার গান ছিল এতদিন। এখন কেমন যেন সব অন্যের হয়ে গেল। বইটি না পড়লে আমার গানগুলি সব আমারই থাকত।"

এতক্ষণে যেন চোখ খুলে গেল অখিলেশের। সুধীর চক্রবর্তী বইটির খুবই প্রশংসা করেছেন তাঁর লেখায়। যা পড়ে অখিলেশ কিনেছিলেন বইটা। পড়ার পরে নিজেও অভিভূত হয়েছেন। কিন্তু এবার ওর কথা শুনে বুঝলেন বইটি হল বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা এক বিশেষজ্ঞের বই। সাধারণ শ্রোতা, সাধারণ পাঠক শুধু গানটিকেই শুনতে চায়। ওর মতো মন কারও থাকলে সে গানটিকে বারবার পড়তেও চায়। মাঝখানে কোনও বিশেষজ্ঞের হস্তক্ষেপ চায় না। কারণ তাতে 'আমি আর গান' এই দু'জন মাত্র আর থাকে না। তৃতীয় ব্যক্তি এসে ঢুকে পড়ে মাঝখানে। সেই অনুপ্রবেশ খাঁটি পাঠক পছন্দ করে না। তার নিজের মতো করে রসগ্রহণের বাধা সৃষ্টি হয়। সেদিন বড় মূল্যবান একটা শিক্ষা পেয়েছিলেন অখিলেশ ওর ওই কথাটি থেকে।

আজ ভাবেন অখিলেশ, ও আর অখিলেশ যে-সময়টুকু যাপন করেছেন, তা যেন গভীর এক গানের মতো। অখিলেশ আর ও, যেন আমি আর গান। ও যেন গানের মতো ছিল। আর সেই গান, মাঝপথে ভেঙে গেল অতর্কিতে। আজ সেই ভেঙে যাওয়ার পর দু'শো একচল্লিশ দিন পার হচ্ছে।

চার

কয়েক বছর আগে একবার অখিলেশের চোখের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। লিখতে গেলে তো বটেই, এমনকী কিছু পড়তে গেলেও প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে যেত। সংবাদপত্রের হেডিং পড়লেও তখন মাথা ধরে যায়। একের পর এক ডাক্তার দেখানো চলল। কিন্তু চশমার পাওয়ার আর কিছুতেই ঠিকমতো বসছে না চোখে। কাগজে কলম ছোঁয়াতে আর পারছেন না তখন অখিলেশ। ওদিকে মনে কবিতা আসছে। কিন্তু লেখার উপায় নেই।

ও বলল, "আমি লিখে দেব। কলেজ ছুটির পর নিয়মিত চলে আসতে লাগল বিকেলে। অখিলেশের লিখতে বসার সময়টা কমাল। সকাল দশটা নাগাদ রোজই খাতা-কলম নিয়ে বসার অভ্যাস অখিলেশের। এবার অভ্যাসটি একই রইল। শুধু বসার সময় খাতা-কলম সঙ্গে রইল না আর। খাতা-কলম ছাড়াই বারান্দায় বা পড়ার ঘরে চুপ করে বসে থাকেন অখিলেশ। মনে মনে কবিতা তৈরি করেন। খুব ছোট ছোট কবিতা। চার-পাঁচ-ছয় লাইনের কবিতা। এক-একটি সাত-আট লাইনেরও হয়ে যায়। মনে মনে চার-পাঁচটি কবিতা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর অখিলেশ অপেক্ষা শুরু করেন। কখন আসবে ও? এই অপেক্ষার সময়টা অখিলেশ কারও সঙ্গে কথা বলেন না। কোনও ফোন ধরেন না। পাছে মনে ধরে রাখা কবিতার লাইনগুলি থেকে কোনও শব্দ ভুলে যান অখিলেশ। ও এসে গেলে তবে কথা বলতে গিয়ে!

বিকেলে ঠিক সময়ে এসে পড়ে ও। খাতা-কলম নামিয়ে আনে নিজেই। কপি করতে বসে যায়। মনের ভিতর এতক্ষণ ধরে সঞ্চয় করে রাখা লাইনগুলি ধীরে ধীরে বেরতে শুরু করেন অখিলেশ। ও মাথা নিচু করে বসে লিখে নেয়। যতিচিহ্নগুলি বলে দেন অখিলেশ, কবিতাটি শেষ হওয়ার পর। যত্ন করে ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয় ও। ওর হস্তাক্ষর সুন্দর। অক্ষরগুলি ছোট ছোট, কিন্তু খুব স্পষ্ট। একটুও জড়ানো হস্তাক্ষর নয় ওর। হত কী, মনে জমিয়ে রাখা চার-পাঁচটি কবিতা কপি করা হয়ে যাওয়ার পর অখিলেশের মনে নতুন কবিতা আসত। তখন অখিলেশ মনে মনে কবিতাটি লিখে নিতেন। আর পাশেই খাতা-কলম হাতে নীরবে বসে থাকত ও। কতবার এমন হয়েছে বাড়ির কাজের মেয়ে অলু চা দিতে এসে দেখেছে দু'জন মানুষ বসে আছে— কারও মুখে কথা নেই। অখিলেশ কখনও কখনও পদচারণা করতেন ঘরের মধ্যে আর ও চুপ করে বসে খাতার মলাটে কলম দিয়ে আঁকিবুকি কাটত। বাইরের বারান্দায় ওয়াশিং মেশিন চলছে— তার যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসত ঘরে। কখনও রান্নাঘরে খাবার গরম করা হচ্ছে মাইক্রোআভেনে— তার অস্ফুট গোঁ-ও-ও আওয়াজ শোনা যেত ওর আর অখিলেশের নীরব মুহূর্তগুলিকে ভেদ করে। ওই মাইক্রোআভেনটি অখিলেশেরই এক জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল ও। ট্যাক্সি থেকে নামছে, হাতে সাদা পিচবোর্ডের বাক্স।

এদিকে অখিলেশের নতুন লেখাটি শেষ হওয়া মাত্র অখিলেশ অধৈর্য হয়ে পড়তেন। যেন এক্ষুনি কবিতাটি হারিয়ে যাবে। উত্তেজিতভাবে বলতেন, "দিন, লিখুন। শিগগির লিখে নিন।" ও লিখতে শুরু করত। লেখা মনে মনে সদ্যই শেষ করার প্রতিক্রিয়ায় এবার একটু দ্রুতলয়ে বলতেন অখিলেশ, নিজের অজান্তেই। কিন্তু ভুল লিখতে গিয়ে হস্তাক্ষর একটুও আঁকাবাঁকা হত না ওর। একবার বলেছিল, "সদ্য শেষ করা কোনও লেখা যখন বলতে থাকেন আপনি, তখন মনে হয় কপি না করে আপনার দিকেই তাকিয়ে থাকি!"

অখিলেশ কিছুই বুঝতে না পেরে বলেছিলেন, "সে কী! কপি না করে তাকিয়ে থাকবেন? কেন?"

ও বলেছিল, "আপনি তো তখন নিজেকে দেখতে পান না। একেবারে একটা শিশুর মতো লাগে আপনাকে। সর্বদা ছটফট করছেন। যে-কবিতা এইমাত্র পেলেন, সে লেখাকে এক্ষুনি এক্ষুনি বলে দিতে না পারলে সে কোথাও উধাও হয়ে যাবে যেন! উড়ে পালাবে।"

অখিলেশ খুব অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, কী করে একেবারে ঠিক জিনিসটা বুঝতে পারল ও? অথচ ও তো নিজে কিছু লেখে না!

ও আরও বলেছিল, "সারাদিন ধরে যে-চার-পাঁচটা কবিতা ভেবে রাখেন, সেগুলি বলার সময় মোটেই অস্থির থাকেন না আপনি। হয়তো সারাদিন ধরে মনে মনে বলে বলে কবিতাগুলি অন্তরে বসে যায় আপনার। তাই আমাকে দিয়ে কপি করানোর সময় আস্তে-ধীরে বলেন। কিন্তু নতুন যে-লেখাটা এল, সেটা বলার সময় উত্তেজিত হয়ে পড়েন।"

এ প্রসঙ্গ উঠেছিল কেন, সেটা বলা দরকার। একদিন দ্রুত পরপর দু'খানি কবিতা মাথায় এসেছে অখিলেশের। অখিলেশ বলেছেন, ও কপি করে নিয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পর ব্যাগ থেকে মোবাইল বার করে ও বলল, "একবার এদিকে তাকান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর একটা নেব। আর একবার তাকান।"

ছবি তুলল দুটো। কেন হঠাৎ ছবি তোলা জানতে চাওয়ায় বলেছিল ওই কথাগুলি। বলেছিল, "এই সময়টা, নতুন একটা কবিতা বলে দেওয়ার পর দারুণ উজ্জ্বল দেখায় আপনাকে। মনে হয় একটি বালক।"

অখিলেশের চোখ যে ওকে সবসময় উজ্জ্বলতাময়ী রূপে দ্যাখে,

সেকথা সেদিন বলতে পারেননি অখিলেশ। সেদিন ওর পরনে ছিল নীল-সাদা সালোয়ার কামিজ। চুল টানটান করে বাঁধা। ওর সামনের দাঁত দুটো একটু উঁচু। অথচ হাসলে খুব সুন্দর দেখায়। সেদিনও ওর টানা টানা চোখের তলায় হালকা কাজললেখা। আঁখিতারা দু'টি সেদিনও জ্বলজ্বল করছে।

চকিতে, বিদ্যুৎচমকের মতো, ওই আখিতারার দিকে তাকিয়ে, অখিলেশের মনে হল সব কিছু ছেড়েছুড়ে এর সঙ্গে দূরে কোথাও চলে যাই।

পরক্ষণেই চেতনা ফিরল, এ আমি কীসব ভাবছি! আমার কাঁধে কত দায়িত্বভার! মনের এ কী পাগলামি আমার!

মানস-লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করে করে তিন লাইন বিশিষ্ট কবিতার একটি রূপে পাকাপাকিভাবে পৌঁছলেন অখিলেশ। এক লাইন, তারপর স্পেস, আবার এক লাইন, তারপর আবার স্পেস, অবশেষে শেষ লাইন। অখিলেশ তাঁর প্রথম যৌবনে হাত পাকাবার জন্য অনেক সনেট বা চতুর্দশপদী লিখেছিলেন, যেসব লেখা থেকে খুব অল্পই প্রকাশ করতে দেন। সনেটে অকটেভ, সেসটেট বা অষ্টক, ষটক থাকে। প্রথম আট লাইনকে বলা হয় অষ্টক, শেষ ছয় লাইনকে ষটক। প্রৌঢ় বয়সে এসে লাইনের সংখ্যাটা তিনি নির্বাচন করলেন। প্রথমে একটি লাইন চিন্তা করেন। প্রথম লাইনটি পাকাপোক্তভাবে মনে বসে যাওয়ার পর দ্বিতীয় লাইনটি স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। দ্বিতীয় লাইনটি অখিলেশ ফেলে দেন বা বাতিল করেন। ওখানে একটা স্পেস এসে যায়। তারপর তৃতীয় লাইনটি আসে ষটকের। এই লাইনটি অখিলেশ মনে ধরে রাখেন কবিতার দ্বিতীয় লাইন হিসেবে। তারপর তৈরি হয় ষটকের চতুর্থ লাইনটি। সেই লাইনটিও অখিলেশ বাতিল করেন। ওখানে আবার একটা স্পেস এসে যায়। এরপর দ্রুত লয়ে এসে পড়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইন দু'টি। দু'টি লাইনের একটিকে রেখে অন্যটিকে ফেলে দেন অখিলেশ। এইভাবে ছয় লাইনের একটি কবিতা কমতে কমতে তিন লাইন বিশিষ্ট কবিতায় এসে দাঁড়ায়— যার মাঝখানে দু'টি স্পেস রাখা আছে।

এরকম এক-একটি কবিতা লিখতে কুড়ি মিনিট থেকে আধঘণ্টা সময় লাগে অখিলেশের। মনের ভিতর সংযোজন ও বর্জনের কাজটুকু ঘটতে থাকে তো— তাই এই সময়টুকু লাগেই।

এই আধঘণ্টা নিশ্চুপে কলম হাতে খাতার সামনে বসে থাকে ও। অখিলেশ কখনও জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, কখনও বা ঘরে অস্থিরভাবে পদচারণা করেন, ওর পাশে এসেই চুপ করে বসে থাকেন কখনও। ও কিন্তু স্থির। পুরো তিন লাইনের লেখাটি সম্পূর্ণ হলে তবে অখিলেশ বলেন, "এবার লিখুন," ও সঙ্গে সঙ্গে লিখতে শুরু করে। তিনটি মাত্র লাইন, লিখতে মোটেই বেশি সময় লাগে না। একটা লেখা শেষ করা মাত্রই অখিলেশ মাঝে মাঝে পরের কবিতাটি ভাবতে শুরু করে দেন। ওইভাবেই মনে মনে সংযোজন-বিয়োজন ঘটতেই থাকে এবং ওইভাবেই ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে থাকেন। ও ঠিক আগের মতোই কলম হাতে নিশ্চুপে বসে থাকে।

এখন অখিলেশ মাঝে মাঝে সেইসব দিনের কথা ভাবেন। অখিলেশের এখন মনে হয়, মানস-লিখন পদ্ধতিতে লেখা তৈরি করার সময় অখিলেশ বুঝতেই পারতেন না আধঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট কত দ্রুত চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওর কাছে তো সময়টা মানসিকভাবে ব্যস্ত থাকার বা মনে মনে কাজ করে চলার সময় ছিল না। ওর কাছে সময়টা ছিল শুধুই অবলম্বনহীন অপেক্ষার। কতখানি ধৈর্য থাকলে ওইভাবে অপেক্ষারত থাকা যায়, এতটুকুও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে। অখিলেশের কাছে ডিকটেশন নিতে সবার আগে নিজের ফোন পুরো অফ করে দিয়ে বসত ও। একদিন কথায় কথায় অখিলেশ ওকে জানিয়েছিলেন ওই তিন লাইনের কবিতা লেখার ভিতরের পদ্ধতির কথা। আসলে যে অখিলেশ ছয় লাইন ভেবে তার থেকে তিনটি লাইন মাত্র রাখেন, বাকি তিনটি লাইন ফেলে দেন— এ কথা জেনে খুব বিস্মিত হয়েছিল ও। তারপর একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল। বলেছিল, "যে-লাইনগুলো ফেলে দিচ্ছেন, সেগুলো সব আমাকে দিয়ে দেবেন, হ্যাঁ? বলে দেবেন আমাকে, কেমন?"

অখিলেশ বলেছিলেন, "মানে?"

ও যেন কোনও বাচ্চা ছেলেকে বোঝাচ্ছে, এইরকম মুখ করে বুঝিয়ে বলেছিল অখিলেশকে।

"মা-আ-নে, আপনার কবিতার যেসব লাইন আপনি বাতিল করছেন, সেগুলো আমাকে দিয়ে দেবেন এবার থেকে। আপনার না-লেখা কবিতার লাইন আমি নিজের ডায়েরিতে লিখে রেখে দেব। ওগুলো আমার কাছে চিরকাল থাকবে।"

অখিলেশ বলেছিলেন, "পাগলের মতো কথা! কী হবে ওসব লাইন রেখে দিয়ে? ওসব লাইন তো কোনওদিন কবিতায় লেখা হবে না!"

ও বলেছিল, "না! হোক লেখা কবিতায়। ওদের সঙ্গে আমি নিজের খুব মিল পাই। আমিও তো একটা না-লেখা কবিতার লাইন। বলুন, তাই না?"

অখিলেশ অবাক। বলেছিলেন, "এ কথার মানে কী?"

ও একটু ম্লান হেসেছিল। বলেছিল, "যেসব লাইন আপনার মনে আসে, আর আপনি কিছুতেই তাদের কবিতায় নিতে পারেন না— আমিও তো সেরকমই, বলুন? আপনার কবিতার ওই দ্বিতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম লাইনের মতোই ঠিক এককরম, যাদের বাতিল হওয়াই নিয়তি। আমাকেও তো আপনি কোনওদিন আপনার জীবনের মধ্যে নিতে পারবেন না। অথচ আমিও এসেছি, এসে পড়েছি। আমাকেও একদিন বাতিল করে দেবেন আপনি। বলুন, তাই না?"

শুনে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন অখিলেশ। কোনও উত্তর খুঁজে পাননি। সত্যিই তো তিনি একজন সংসারী মানুষ। এ কথার উত্তর তাঁর কাছে কোথায়? তবে ও নিজেই যে একদিন অখিলেশকে বাতিল করে দিয়ে চলে যাবে, তা কি অখিলেশ কখনও ভাবতে পেরেছিলেন?

পাঁচ

আজকে দু'শো উনসত্তরতম দিন। ওকে না-দেখার দু'শো আটষট্টি দিন পার হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনটাও পার হয়ে যাবে। এতগুলো দিন ওকে না দেখে আছেন অখিলেশ। আগামী দিনগুলিতেও আর কখনও দেখা হবে না। তা সত্ত্বেও এই দিন গুনে গুনে চলার চক্র থেকে নিজের মনকে সরিয়ে আনতে পারছেন না অখিলেশ। ওর আসাটা এ বাড়িতে এতটাই স্বাভাবিক ছিল একসময় যে, মনে হত ও অখিলেশের পরিবারেরই একজন। ও মাত্র তিনরকম মাছ খেতে ভালবাসত। ইলিশ, চিংড়ি আর রুই। সুরমা, অখিলেশের স্ত্রী চিংড়ি অথবা ইলিশ বাড়িতে রান্না হলেই ওকে ফোন করতেন। সুরমা কখনও ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি ওর আর অখিলেশের আসল সম্পর্ক কী। অখিলেশ নিজেও কি প্রথম প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন? না। তিন-চারটি সূত্রের উপর ভর করে চলতে চলতে অখিলেশ আর ওর মধ্যে একসময় প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। ওর দাবি, অখিলেশের যা যা বই দরকার সবই ও কিনে এনে উপহার দেবে। অথচ উপহার দেওয়ার সময় বইগুলিতে কিছুই লিখে দিত না ও। থেকে থেকেই বলত, আপনি কী কী বই দরকার আমাকে বলুন। সাধারণত অদ্ভুত একটা গলায় বলত, "আপনি কিন্তু অনেকদিন আমাকে কোনও বই আনতে বলছেন না! আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?" এ কথা শুনলে অখিলেশের ভিতরে কী যে হত! কোনও প্রয়োজন না থাকলেও দুটো-একটা বইয়ের নাম বলে দিতেন— যা কলেজ স্ট্রিটে খুঁজলে পাওয়া যায়।

শুধু কলেজ স্ট্রিট? আমাজন থেকে ইন্টারনেটে অর্ডার করে বই আনিয়ে দিত ও। সে বইটি অবশ্য সত্যিই পড়তে চেয়েছিলেন অখিলেশ। 'লাভ লেটার্স অফ লিউইজি পিরানদেল্লো'। নাটক রচয়িতা ও গদ্যলেখক পিরানদেল্লোর বয়স যখন ষাট, তখন তাঁর সঙ্গে অভিনেত্রী মার্টা আব্বার

আলাপ হয়। মার্টা আব্বার বয়স তখন চব্বিশ। পিরানদেল্লোর বিখ্যাত নাটক 'সিক্স ক্যারেক্টারস ইন সার্চ অফ অ্যান অথর' নাটকে অভিনয় করছিলেন মার্টা। রিহার্সালে গিয়েছিলেন পিরানদেল্লো। তখনই আলাপ। সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ প্রেম সম্পর্কে পরিণত হয়। তারপর আরও নয় বছর বেঁচে ছিলেন পিরানদেল্লো। সেই নয় বছরে অজস্র চিঠি লিখেছিলেন মার্টাকে। পিরানদেল্লো শেষ জীবনে খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে রোমে একাকী একটি ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রায় বছর দেড়েক আগে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। নোবেল পুরস্কার তাঁর নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারেনি। নোবেল পাওয়ার পর সুইডেন থেকে ফিরে তিনি যখন স্বদেশের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থেকে নামলেন, তখন স্টেশনে পিরানদেল্লোকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য একজনও উপস্থিত ছিল না।

১৯৩৬-এর পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯৮৬ সালে মার্টা আব্বা নিজের তিরাশি বছর বয়সে পৌঁছে চিঠিগুলি প্রকাশ করতে দেন। ওই পত্রগুচ্ছ যিনি সম্পাদনা করেছেন, তিনি বইয়ের প্রথমে জানিয়েছেন একটি মনে রাখবার মতো কথা। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও মার্টা ওই চিঠিগুলির বিষয়ে ভূমিকা হিসেবে কিছু লিখতে রাজি হননি। কেবল একটা কথাই মার্টা জোর দিয়ে বলে গিয়েছেন সব অনুরোধের উত্তরে। ওই একটাই কথা, "যা বলার তা এই চিঠিগুলি নিজেরাই বলবে।"

মৃত্যুর মাত্র একমাস আগে একটি চিঠিতে বলছেন পিরানদেল্লো, "যা কিছু লিখেছি আমি, তা কোনও উচ্চাশা থেকে নয়— জন্মেছি, এই ঘটনার জন্যই মাত্র।"

পিরানদেল্লোর চিঠির ওই বইটি কিছুদিনের জন্য পড়তে নিয়েছিল ও। বইটি যখন ফেরত পেলেন অখিলেশ, তখন দেখলেন বইয়ের মধ্যে অনেক জায়গা হালকা পেনসিলের দাগে আন্ডারলাইন করা।

এখন ওই বইটি খুললেই অখিলেশ আগে খুঁজে বার করেন পেনসিলে ওই আন্ডারলাইন করা জায়গাগুলিকে। অখিলেশের মনে হয় ওর চোখ এই লাইনগুলি বারবার পড়েছে একদিন। আজ ওর সঙ্গে দেখা হয় না, কখনও দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই আর— তবু এই পেনসিলের দাগে দাগে ওর উপস্থিতি আছে। বইটি ফেরত দিতে গিয়ে বলেছিল, "এ বই পড়বার সময় কয়েক জায়গায় দাগ দিয়েছি কিন্তু। রাগ করলেন? এত ভাল লাগল জায়গাগুলো যে, আন্ডারলাইন না করে পারলাম না। আর একটা কথা বলব?"

অখিলেশ বলেছিলেন, "বলুন না।"

ও বলেছিল, "আমি ভাবলাম আপনি যখন পড়বেন, পেনসিলের দাগগুলো দেখে আপনার মনে হবে আমার এই এই লাইনগুলো, এই এই কথাগুলো ভাল লেগেছিল। খুব ভাল লেগেছিল। যখন বইটা পড়ছি তখন তো আর আপনাকে সামনে পাচ্ছিলাম না। আমি তো বইটা ডিপার্টমেন্টেও নিয়ে যেতাম। ক্লাস অফ থাকলে পড়তাম, রাতে শুতে যাওয়ার আগেও পড়তাম— পড়তে পড়তে কোন কোন জায়গা খুব ভাল লাগছে, তক্ষুনি তক্ষুনি আপনাকে জানাতে ইচ্ছা করত। কিন্তু জানানোর তো কোনও উপায় থাকত না তখন। তাই দাগ দিয়ে রেখেছি। অন্য কারণে নয়। আপনার জন্যই এই দাগ দেওয়া।"

আজ ওই পেনসিলের দাগগুলি দেখে 'আপনার জন্যই এই দাগ দেওয়া' কথাটা মনে পড়ে অখিলেশের। মনে পড়ে বলাটা ভুল হবে— মনে কেটে বসে যায়। টাটকা কাঁচা কাটা থেকে রক্ত পড়ে। সেই রক্তক্ষরণ দ্রুত অখিলেশের পুরো মনকে আচ্ছাদিত করে দেয়। তখন আবার সেই কালো ঢেউ ঢুকে পড়ে অখিলেশের বুকে। শ্বাসরোধকারী অবস্থাটা ফিরে আসে অখিলেশের।

নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য অখিলেশ পিরানদেল্লোর বইটি ছেড়ে উঠে পড়েন। ধীরে ধীরে পদচারণা করতে থাকেন ঘরের মধ্যে। এখন বাড়িতে কেউ নেই। স্ত্রী বেরিয়েছেন। অখিলেশ একটা চেয়ারে বসে পড়েন। ডাক্তারের বলা একটি পরামর্শ অখিলেশের মনে পড়ে। ডাক্তার বলেছিলেন, "যখনই মনে হবে ওই কালো ঢেউয়ের মতো জিনিসটা বুকের ভিতর ঢুকে পড়ছে আর দম বন্ধ হয়ে আসছে, তখনই সোজা হয়ে বসে ডিপ ব্রিদিং করবেন। প্রথমে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনতে গুনতে একটি শ্বাস গ্রহণ করবেন বুক ভরে। তারপর আবার এক থেকে দশ গুনতে থাকবেন একই রকম ধীর গতিতে— আর এবার শ্বাসটি ছাড়তে থাকবেন। ডান নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করবেন, বাঁ নাক দিয়ে ছাড়বেন। এরকম কয়েকবার করার পর দেখবেন বুকের ওই দমচাপা ভাব অনেকটা কমে এসেছে।"

অখিলেশ চেয়ারে বসে পিঠ সোজা করে ওইভাবে ধীরে ধীরে শ্বাসগ্রহণ এবং শ্বাসত্যাগের প্রণালীটি অনুসরণ করে চললেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খোলা মাত্রই আচমকা অখিলেশের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বইয়ের আলমারির দিকে। বেশ কয়েকটি বইয়ের আলমারি আছে এ বাড়িতে। তারই একটির দিকে দৃষ্টি পড়েছে অখিলেশের। কাচের ভেতর থেকে অখিলেশের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে একটি বইয়ের মলাট। বইটির নাম 'এমপায়ার অফ দ্য স্টারস'। জ্যোতির্বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বিষয়ে অনেক কথা বলা আছে এ বইয়ে। বিজ্ঞান জগতে বিখ্যাত 'চন্দ্রশেখর লিমিট' বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে এখানে। কাকে বলে 'চন্দ্রশেখর লিমিট'। বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর জাহাজে যাচ্ছেন সমুদ্রপথে— এক গভীর রাত্রে, তারাভরা আকাশের তলায়, জাহাজের ডেকে বসে, কীভাবে কয়েক মুহূর্তে এই ধারণাটি ধরা দিয়েছিল চন্দ্রশেখরের কাছে— তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এ বইয়ে দিয়েছেন বইটির লেখক আর্থার আই মিলার। সেই বইও আমাজন থেকে অর্ডার দিয়ে অখিলেশের জন্য আনিয়ে দিয়েছিল ও-ই। 'চন্দ্রশেখর লিমিট' সম্পর্কে জানতে একদা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন অখিলেশ এবং বিষয়টি বোঝার জন্য গিয়েছিলেন তাঁর এক বিজ্ঞানী বন্ধুর কাছে, সাহা ইনস্টিটিউট— যেহেতু অখিলেশের সেই বিজ্ঞানী বন্ধু ওই ইনস্টিটিউটে কর্মরত।

বন্ধুটি অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট নন, তিনি রসায়নবিদ, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করেন এরকম একাধিক বিজ্ঞানীর সঙ্গে অখিলেশের বন্ধুর চেনাজানা আছে, তাই অখিলেশের যাওয়া। অখিলেশের বন্ধু সেরকম দু'জন পরিচিতকে বলে রেখেছিলেন অখিলেশের সঙ্গে কথা বলানোর জন্য। তাঁরা এসেছিলেন। অখিলেশকে মোটামুটি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন 'চন্দ্রশেখর লিমিট' কাকে বলে। তারপর তাঁরা চলে গিয়েছিলেন।

ওই দু'জনের একজনের হাতে অখিলেশ দেখেছিলেন 'এমপায়ার অফ দ্য স্টারস' বইটি— প্রচ্ছদের নীচের দিকে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের একটি যুবা বয়সের ছবিও দেওয়া আছে, বিজ্ঞানীর চোখের দৃষ্টি যেখানে মলাট থেকে সোজা পাঠকের চোখে এসে পড়ছে। বইটি একবার চেয়ে নিয়ে লেখক ও প্রকাশকের নাম মনে মনে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন অখিলেশ। সেদিন 'চন্দ্রশেখর লিমিট' সম্পর্কে দুই বিজ্ঞানীর মুখে যতটুকু শুনেছিলেন অখিলেশ, তার ফলে অখিলেশের পিপাসা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অখিলেশ আরও বিশদ করে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছিলেন। সেজন্যই বইটি একবার দেখার জন্য হাতে নিয়ে লেখক ও প্রকাশকের নাম দু'টি মনে গেঁথে নিয়েছিলেন। বাড়ি এসে লিখেও রেখেছিলেন সব।

এরপর ও যেদিন দেখা হবে বাড়িতে, অখিলেশ সাহা ইনস্টিটিউট যাওয়ার গল্পটি বললেন ওকে। বইটির কথাও বললেন। শুনেই ও বলল, "বইয়ের নাম লেখা কাগজটা আমাকে দিন। এক্ষুনি। দি-ই-না।"

ও যখন এইরকম করে 'দি-ই-না' বলে আর পূর্ণ চোখে তাকায়, তখন অখিলেশের ভিতরে সেই আলো জ্বলে ওঠে। 'দি-ই-না' লেখে একচামচ চিঁড়েভাজা হোক, থালা থেকে একমুঠো মাখা ভাত-তরকারিই হোক, আর বইয়ের নাম লেখা কাগজই হোক— ওকে না দিয়ে পারেন না অখিলেশ। ওইভাবে ও যখন 'দি-ই-না' বলে, অখিলেশের মনে হয় সাধ্য থাকলে পুরো পৃথিবীটাই ওর হাতে একটা গোল বলের মতো তুলে দিতেন।

'এমপায়ার অফ দ্য স্টারস' একদিন ও বার করল ওর ব্যাগ খুলে। মোটা ইংরেজি পেপারব্যাক। তার অক্ষরগুলো এত ছোট ছোট যে, অখিলেশ দু'দিন ধরে পড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। 'লাভ লেটার্স অফ লুইজি পিরানদেল্লো' ছিল হার্ড বাউন্ড, অক্ষরগুলোও বড়। এই বইটি

অখিলেশ একেবারে পড়তে যে পারছেন না, তা নয়। কিন্তু কষ্ট করে অর্ধেক পৃষ্ঠা পড়লেই মাথার যন্ত্রণা শুরু হচ্ছে।

দু'দিন পর এক বিকেলে ও এসেছে, এসে শুনেছে বইটি পড়তে কষ্ট হচ্ছে অখিলেশের। বলল, "বইটা কই? আমাকে দিন তো!" অখিলেশ বই এনে দিলেন। ও বইটা খুলে ধরল চোখের সামনে। তারপর বলল, "আমি পড়ছি, আপনি শুনুন। কেমন?"

প্রথম চ্যাপ্টার থেকে পড়তে শুরু করল। বাড়িতে সেদিনও কেউ নেই। দু'জন মাত্র প্রাণী। ও ধীরে ধীরে স্পষ্ট নির্ভুল ইংরেজি উচ্চারণে পড়ে চলেছে একের পর এক পৃষ্ঠা। মাঝে মাঝে থেমে একটু হাসছে অখিলেশের দিকে তাকিয়ে, লেখার তারিফ করা হাসি। দু'জন মানুষ, বিজ্ঞানের কঠিন জটিল বিষয়ে প্রবেশ করছে— একজন কথক, অন্যজন শ্রোতা।

সেদিন প্রথম অধ্যায়টুকু শুধু পাঠ করা সম্ভব হল। প্রথম অধ্যায় শেষ হবার পর ও ঘড়ি দেখল। ন'টা বাজে। "এবার যাই, এমনিতেই দেরি হয়ে গেল," এ কথা বলে ও মোবাইল ফোন থেকে উবর ডাকার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যাওয়ার আগে বলল, "আপনি চোখের উপর স্ট্রেন করে পড়ার চেষ্টা একেবারে করবেন না কিন্তু। আমার আসার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি তো আসবই।"

এরপর দু'দিন অন্তর, কখনও একদিন অন্তর ও আসত, আর এসেই বলত, "বইটা নিয়ে আসুন।" ছাত্র ও শিক্ষিকা দু'জনেই মগ্ন হয়ে যেত। একজন পড়ছে, আর-একজন শুনছে। পড়ে শোনানোর টানে কখনও কখনও পরপর দু'দিনও এসে উপস্থিত। একদিন তো দুপুরবেলায় বেল বাজল। সুরমা দরজা খুলে দ্যাখেন ও দাঁড়িয়ে। সুরমা খেতে বসতে যাচ্ছিলেন। ওকেও ডেকে নিলেন। টেবিলে বসে খাওয়া শেষ হতে না হতেই ও হুকুম, "কই, বইটা নিয়ে আসুন।" আবার পড়তে শুরু করল ও। তার আগে বলল, "আজকে ইচ্ছে করেই দুপুর-দুপুর এলাম। অনেকটা পড়া যাবে।"

এইভাবে পুরো বইটা ও পড়ে শুনিয়েছিল অখিলেশকে। পড়ে শোনানোর দুপুর-বিকেলগুলোয় একমাত্র ওয়াশিং মেশিন চলার আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই কোথাও। মেয়ে টুকুন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে খেতে চাইলে তার জন্য খাবার গরম করা হত মাইক্রোঅ্যাভেনে। অল্পক্ষণের জন্য গোঁ-ও-ও একটা শব্দ। সব কিছুর মধ্যে ওর পড়া চলছে কিন্তু। সুরমা অবাক হয়ে দেখতেন দু'জনকে। নিজের স্বামীকে ওই সময়টুকুর জন্য যে সুরমার কখনও কখনও একটু অচেনা মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু দু'জনের বয়সের এতটা তফাত আর এত স্বাভাবিক মেলামেশার ধরন দু'জনের যে, সন্দেহ করার কথা কখনও মনেই আসেনি সুরমার। বরং ভেবেছেন, তাঁর স্বামীর চোখের অসুবিধে, পড়তে কষ্ট হয়, লিখতে কষ্ট— কেউ যদি লিখে দেয় বা পড়ে শোনায়— সে তো সাহায্যই করছে তাঁর স্বামীকে।

আজকে এখন, দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বাস নেওয়া ও শ্বাস ত্যাগ করার কাজ শেষ করেছেন যখন অখিলেশ, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বইয়ের আলমারির দিকে। কাচের আচ্ছাদনের ভিতর বইয়ের মলাট থেকে সোজা অখিলেশের দিকে তাকিয়ে আছে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের চোখের ছবি। আবারও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল অখিলেশের। মনে হল বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের দৃষ্টি নয়— যেন ও তাকিয়ে আছে, ও। বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে, কবিতা কখি পকে দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, এক-একবার চোখ তুলে তাকিয়ে থাকত অখিলেশের দিকে। কোনও কথা না বলে শুধু তাকানো। চশমার পিছনে টানা টানা চোখ, হালকা কাজলরেখা চোখে, আখিতারা দু'টি দীপ্ত, উজ্জ্বল। ও তাকিয়ে আছে। চন্দ্রশেখরের ছবি নয়, ও। আজ নিয়ে দু'শো চুয়াত্তর দিন যে তাকানো দেখতে পাননি অখিলেশ। ভবিষ্যতেও কখনও দেখতে পাবেন না।

ছয়

ওর সঙ্গে অখিলেশের আরও একটি যোগসূত্র ছিল 'গীতবিতান'। বড় নিবিড় সেই যোগসূত্র। ও অখিলেশের বাড়িতে এসে কোনও-কোনওদিন প্রথমেই সন্ধান করত গীতবিতানটি কোথায়। অখিলেশের মেয়ে টুকুন মাঝে মাঝেই গীতবিতান খুলে গান গায়। ফলে গীতবিতানটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা থাকে না অখিলেশের বাড়িতে। ও এভাবে বলত, "আজকে গীতবিতানটা কোথায় রেখেছেন?" অখিলেশ বলতেন, "আমি তো হাত দিইনি। টুকুন গীতবিতান নিয়ে গান গাইছিল গত রাত্রে, কোথায় রেখেছে টুকুন আমি দেখছি"— এই বলে উঠে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন অখিলেশ— তখনই "আপনি বসুন, আমি দেখছি" বলে দ্রুত উঠে দাঁড়ায় ও। বইয়ের তাক থেকে অথবা ও ঘরের বিছানা থেকে নিয়ে আসে "অখণ্ড গীতবিতান' বইটি। ও যখন উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ করে, তখন ওর হাইট চোখে পড়ে। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা ও। উঠে দাঁড়ানোর পরেই ওর স্তব্যব হল সালোয়ার কামিজের কামিজটা হাত দিয়ে নীচের দিকে একটু টেনে ধরা। তারপর চঞ্চল পায়ে এ ঘর থেকে ও ঘর গীতবিতান খোঁজার সময় হাত দিয়ে ওড়না ঠিক করাও ওর স্তভাবের মধ্যে পড়ে। বই খোঁজার ফাঁকে হঠাৎ একবার ঢুকে পড়ল বাথরুমে। বাথরুমের দরজা খোলাই রাখল, কারণ ও তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে বাথরুমের বড় আয়নাটার সামনে। সেফটিপিন দিয়ে দুই কাঁধে নতুন করে আর একবার আটকে নিচ্ছে ওড়নার দুই প্রান্ত। অখিলেশের চোখে এসব পড়ে কী করে? কারণ, বেশির ভাগ দিনই "আপনি বসুন, আমি দেখছি' বললেও— অখিলেশ মোটেই বসে থাকতেন না।

দিশেহারার মতো বাড়ির এদিক-ওদিক গীতবিতান খুঁজতেন। আসল কথাটা হল, নিজের সম্পূর্ণ অজান্তেই অখিলেশ ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। ওঁর চঞ্চলতা ওকে অনেক জ্ঞতগামী করে তুলত। ফলে অখিলেশের আগেই ও প্রায় প্রত্যেকদিন গীতবিতান খুঁজে পেয়ে যেত— ওদিকে অখিলেশ ওকে ওড়না ঠিক করতে দেখলেই খোলা বাথরুমের সামনে থেকে তৎক্ষণাৎ সরে যেতেন। সেই সুযোগে যে গীতবিতানটি খুঁজে জানবেন, সে কথা আর মনে থাকত না অখিলেশের। আবারও নিজের অজান্তেই ওর রূপমুগ্ধ হয়ে পড়তেন অখিলেশ। ওর দাঁড়িয়ে থাকার আর আয়নায় নিজের মুখ দেখার একাগ্র এবং অপরূপ ভঙ্গিমাটুকুই অখিলেশের মন ঘিরে রাখত তখন। গীতবিতান খোঁজার কথা ভুলে বারান্দার ধারে এসে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন অখিলেশ। একটু পরেই ও যখন 'এই যে, পেয়েছি গীতবিতান' বলে বইখানি হাতে নিয়ে এসে রূপ করে বসে পড়ত সোফায়— ওর নির্দিষ্ট জায়গায়— তখন চেতনা ফিরত অখিলেশের।

অখিলেশ এসে ওর মুখোমুখি লম্বা সোফাটিতে বসতেন। ও আপনমনে গীতবিতানের পৃষ্ঠা উলটে যাচ্ছে, কখনও এক মিনিটের জন্য কোনও পৃষ্ঠায় ও গ্রে চোখ থমকে থাকছে— পরক্ষণে আবার সেই পৃষ্ঠা থেকে অন্য আর এক পাতায় চলে যাচ্ছে ও। এরপরেই ও অবধারিতভাবে উঠে এসে বসে পড়ত অখিলেশের ঠিক পাশে। খুলে ধরা গীতবিতানের একটি পৃষ্ঠায় আঙুল দেখিয়ে বলত, "এই গানটা একবার পড়ুন তো।" ওর হাতে ধরা গীতবিতান থেকে গানটি পড়ে শোনাতেন অখিলেশ। এইভাবে দু'জনে একসঙ্গে গীতবিতান থেকে গান পাঠ করে যেতেন একের পর এক। পাশেই রান্নাঘরে সুরমা তখন রান্না করে চলেছেন। রান্না করার জন্য এক মহিলা থাকা সত্ত্বেও টুকিটাকি একটা-দুটো পদ সুরমা রোজই রান্না করতেন নিজে। রান্না শেষ হতেই সুরমা ওকে খেতে ডাকতেন। খোলা গীতবিতান সোফায় রেখে ও খাওয়ার টেবিলে উঠে যেত। অখিলেশের খাওয়া হয়ে যায় দুপুর বারোটার মধ্যে। অখিলেশ চুপ করে বসে রইলেন। পাশেই খোলা গীতবিতান। সুরমা আর ও খেতে খেতে গল্প করতে লাগল।

খাওয়া শেষ হতে ও উঠে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে অখিলেশকে বলল, "আমার একটা প্রশ্ন আছে, একটা গানের লাইন নিয়ে।"

অখিলেশ বললেন, "কোন গান আর কী লাইন?"

ও টাওয়েল বারান্দার তারে মেলে দিতে দিতে বলে, "বলব, আগে

খাবার গরম করা হত মাইক্রোআভেনে। অল্পক্ষণের জন্য গো-ও-ও একটা শব্দ। সব কিছুর মধ্যে ওর পড়া চলছে কিন্তু।

একটু জল খেয়ে নিই।"

বারান্দা থেকে ফিরে এসে খাওয়ার টেবিলে রাখা একটা জলের বোতল তুলে নেয় ও। বোতলটা উঁচু করে গলায় একটু জল ঢেলে নেয়। ওই এক চুমুক বা এক ঢোক জল খাওয়াই হল ওর জল খাওয়া। কখনও গেলাসে ভরে জল নিয়ে ওকে খেতে দ্যাখেননি অখিলেশ। মাঝে মাঝে ভেবেছেন, কতদিন তো চড়া রোদে রাঙা হয়ে আসে। তখন জল চায়। গেলাসে দিতে চাইলে কখনও নেবে না। একটা জলের বোতল তুলে গলায় একটু ঢালবে। ব্যস, ওতেই ওর পিপাসা মিটে যায়। আজকেও তেমনই একটু জল খেয়ে আবার এসে বসল অখিলেশের পাশে। গীতবিতান নিয়ে পাতা উলটে সেই জায়গাটা বার করল যেখানে প্রথম লাইনের সূচি দেওয়া আছে। তারপর সূচি দেখে একটি গান খুঁজে নিয়ে অখিলেশের দিকে এগিয়ে দিল গীতবিতানটি। অথগু গীতবিতানের একটা দিক তখন ওর হাঁটুর উপর রাখা, অন্য দিকটা ধরে আছেন অখিলেশ। দু'জনের মাথা একসঙ্গে ঝুঁকে পড়েছে গীতবিতানের উপর। এইসময় সুরমা এসে অখিলেশকে বললেন, "আমি একটু গড়িয়ে নিচ্ছি, অলকা কাজ করতে এলে বলবে আগে যেন একটু চা করে। তোমাদেরও দেয়, আমাকেও। চা হয়ে গেলে আমাকে ডেকে দিয়ো," বলে সুরমা নিজের ঘরে চলে গেলেন। রান্নার বউটি তিনটে নাগাদ চলে যায়। তিনটে বেজে গিয়েছে কিছুক্ষণ হল। অখিলেশকে ও বলল, "এই লাইনটা দেখুন, এই লাইনটা। 'ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।' দেখেছেন?"

অখিলেশ বলেন, "দেখব না কেন? এটা তো খুব চেনা গান। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে'। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা কী?"

ও বলল, "ঠিক প্রশ্ন নয়। একটা ধারণা। সিদ্ধান্তও বলতে পারেন।"

অখিলেশ জানতে চান, "কী ধারণা?"

ও একটু হাসে। বলে, "বলব? ভয়-ভয় করছে।"

অখিলেশ বলেন, "আমাকে ভয়? এতদিন পরেও?"

হঠাৎ ওর আখিতারা দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "আগের লাইনটা দেখেছেন? আগের লাইনটা শুধু নয়, আগের দুটো লাইন। দেখেছেন?"

অখিলেশ কিছু বুঝতে পারেন না। বলেন, "এ দুটোও তো খুব চেনা লাইন। 'পাগল হাওয়া বুঝতে নারে/ ডাক পড়েছে কোথায় তারে'— আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বলুন তো!"

ও বলে তেমনই একটু চাপা হেসে, "'ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো'— এরা কি ফুল? সত্যি সত্যি ফুলই কেবল? আমার তো মনে হয় না।"

অখিলেশ বলেন, "ফুল নয়? তবে কী?"

জানলা দিয়ে অপরাহ্ণের ঢালু হয়ে আসা রোদ পড়েছে ওর মুখের একদিকে। বাইরে হাইসক্রিমওয়ালার হাঁক শোনা যাচ্ছে।

এই সময় অদ্ভুত একটা হাসি নিয়ে আঁখিতারায় দীপ্তি জ্বেলে ও বলে, "মেয়েদের কথা বলা হয়েছে, আমার সন্দেহ হয়। এমন দারুণ জ্যোৎস্না ফুটেছে, যে-মেয়ের পাশে যাচ্ছে, তাকেই ভাল লাগছে।"

অখিলেশ আবার অবাক হন, "এভাবে তো ভেবে দেখিনি কখনও।"

ওর চোখ-মুখ তখন কীরকম আলো-আলো। ও বলে, "'পাগল হাওয়া বুঝতে নারে', এই যে, এখানে আছে তো? আছে না, বলুন?"

অখিলেশ তখনও কিছু বুঝতে পারছেন না। কেবল এইটুকু বলেন, "হ্যাঁ, আছে।"

ও বলে, "'পাগল হাওয়া' কথাটা চোখে আপনার স্ট্রাইক করেনি কখনও? এই 'পাগল হাওয়া' কী? ঠিক করে বলতে গেলে 'কী' নয়, 'কে'? এই 'পাগল হাওয়া' আসলে কে বলুন তো?"

ওর উদ্ভাসিত মুখে একটা ঝকঝকে দ্যুতি। ওই রূপের সামনে মন্ত্রমুগ্ধ অখিলেশের মাথা কোনও কাজ করছে না। নিজে কী করছেন তা না জেনেই অখিলেশ ওর মুখে হঠাৎ যে-রূপলাবণ্য ঝলক দিয়ে উঠেছে তার দিকেই সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছেন। শুধু বলতে পারলেন, "জানি না।"

ও হাসিতে ভেঙে পড়ার আগে শুধু বলল, "ওই 'পাগল হাওয়া'ই তো কবি। কবি নিজে," বলে হাসতে হাসতে সোফার প্রান্তে, মানে অখিলেশের ঠিক বিপরীত দিকে লুটিয়ে গেল। হাসির ঝোঁকে হাঁটুর উপর থেকে গীতবিতান পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। অখিলেশ ধরে ফেললেন গীতবিতানকে। বই পড়ে যাচ্ছিল দেখে ও-ও চমকে উঠে বলল, "এই যাঃ! যাক, পড়েনি। গীতবিতান মাটিতে পড়ে গেলে আমার খুব কষ্ট হত। আমি যে কী সব করে বসি!"

অখিলেশ বললেন, "কী করে এমন সব কথা মনে হল আপনার? ওই গানের লাইনগুলো থেকে?"

ও বলে, সে কী! কেন মনে হবে না? 'পাগল হাওয়া' রয়েছে যে! কবিদের মাঝে মাঝে এমন হয় না, যেন তারা নিজেরা কিছুই বুঝতে পারছে না! একটু আগেই তো আপনি কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। অথচ আমি বুঝতে পারলাম আর আপনি বুঝবেন না, এটা কখনও হয়?"

অখিলেশ বললেন, "সত্যিই আমি কখনও ওই গানের লাইনগুলোকে এভাবে ভাবিনি।"

ও বলে, "সেটা বলতে পারেন, ওভাবে ভাবেননি।"

অখিলেশ বলেন, "'ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো'— এখানে 'যার পাশে যায়' মানে যে কোনও মেয়ের পাশে যাওয়াও হতে পারে, এ কথাও ভাবিনি।"

ও তখন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়েছে। তবু মুখের আর আখিতারার ওই দপদপে আলো তখনও উজ্জ্বল। বলল, "'পাগল হাওয়া' কথাটা তো আছে। কবিরা একটু কেমন পাগল-পাগল হয় না? হয় না, বলুন?"

অখিলেশ বলেন, "কী জানি!"

ও তখন চোখটা নামিয়ে গীতবিতানের পাতায় রেখে বলে, "আপনি নিজেই তো এখনও কীরকম পাগল-পাগল আছেন।"

অখিলেশ অবাক, "আমি? আমি তো একজন সাধারণ গৃহস্থ মানুষ। কবির কোনও চিহ্ন কি আর এখন আমার মধ্যে দেখা যায়? যায় না।"

ও হঠাৎ পূর্ণ চোখে তাকাল, তাকিয়েই চোখ আবার নামিয়ে নিল গীতবিতানের দিকে। এলোমেলো পাতা উলটে চলেছে। ওইভাবেই বলল মুখ নামিয়েই, "যে দেখতে পায় সে দেখতে পায় ঠিক।"

অখিলেশ বলেন, "মানে?"

ও দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে বলে, "কিন্তু যা-ই বলুন, 'যার পাশে যায়' কথাটা আপনার মনে স্টাইক করল না কেন? ফুলকে শুধু ফুলই ভাবলেন? 'যার পাশে' কথাটা নিয়ে একটুও ভাবলেন না? মেয়েদের পাশে কবিরা তো যান, মেয়েদের পাশেও মেয়েরাও কি কবিদের পাশে আসে না? আমি কি আসিনি? বলে ভরা চোখে তাকাল ও অখিলেশের দিকে। অখিলেশের মনে হল ওই চোখে ডুবে মরে যাওয়া যায়।

ঠিক তক্ষুনি বেল বাজল। মুহূর্তের যে-ঘোর তৈরি হয়ে উঠেছিল, তা ভেঙে গেল। ও উঠে দরজা খুলল। অলকা। ও অখিলেশের দিকে ঘুরে বলল, "সুরমাদি কী কী বলতে হবে বলেছিলেন, বলে দিন ওকে।" অখিলেশ বাস্তবে ফিরে আসেন। এ কী! অখিলেশের যে কিছুই মনে পড়ছে না! সত্যিই তো, সুরমা কী কী বলেছিলেন দুপুরে শুতে যাওয়ার আগে?

ও বলল, "মনে পড়ছে না তো? জানি আপনি ভুলে যাবেন। এরপরেও আপনি দাবি করবেন আপনি কেবল গৃহস্থ মানুষ? একটুও পাগল-পাগল নন? শোনো অলকা, বাসন মাজার আগে দু'কাপ চা করো। এক কাপ বউদিকে দেবে, এক কাপ দাদাকে।"

অলকা 'আচ্ছা' বলে রান্নাঘরে ঢুকে যেতেই অখিলেশ বলেন, "আপনি চা খাবেন না?"

"না, আমি এবার বেরিয়ে পড়ব।"

ও নিজের ব্যাগ খুলে একটা চিরুনি বার করল। তারপর বাথরুমে ঢুকে গেল।

অখিলেশ জানেন, এখন ও বাথরুমের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিচ্ছে।

ও বাথরুম থেকে বেরোবার পর শেষ চেষ্টা করলেন অখিলেশ, "আর একটুখানি বসুন। দশ মিনিট অন্তত। চা-টা খেয়ে যান।"

ও বলল, "আজকে আর নয়। দেরি হয়ে যাবে।"

ব্যাগ তুলে নিল কাঁধে। দুটো হাত দিয়ে কামিজটা স্বভাবমতো নীচের দিকে একবার টানল। বেরোবার আগে বলল, "পরের দিন যখন আসব, দু'জনে মিলে আবার গীতবিতান পড়ব।"

অলকা এইসময় চায়ের কাপ অখিলেশের সামনে নামিয়ে দিয়ে দুপুরের ঘুম থেকে সুরমাকে ডেকে তুলল। পাশের ঘর থেকে অলকার সঙ্গে সুরমার খুঁটিনাটি সাংসারিক কথা টুকরো টুকরো ভেসে আসছে। সোফার সামনের টেবিলে এককাপ চা আর কোলের ওপর খোলা গীতবিতান নিয়ে অসাড় হয়ে বসে রইলেন অখিলেশ।

ও যখন চলে যেত, হঠাৎ কার কথার প্রায় মাঝখান থেকে উঠে চলে যেত। কিছুতেই ওকে থামানো যেত না। তা ছাড়া তেমন জোর করতেও কোনওদিনই পারতেন না অখিলেশ। ওর আসা অথবা যাওয়া কোনওটাই কোনওদিন অখিলেশের ইচ্ছে মেনে হয়নি। ওর ইচ্ছে মতোই হয়েছে।

আজ, যখন ও সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছে, একা ঘরে বসে বসে সেই কথাটাই বারবার ভাবেন অখিলেশ।

সাত

গান ভালবাসেন অখিলেশ। গান ভালবাসে ও। দু'জনে তাই একসঙ্গে গীতবিতান পড়েন। অখিলেশের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান ভালবাসার ধরনটা কীরকম? অখিলেশের জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেই সংগীতপ্রেম। সেটা হয়তো অখিলেশের কৈশোর, অথবা হয়তো অখিলেশের মধ্যযৌবন, বা হয়তো দশ বছরের বালকবেলায় দাঁড়িয়ে অখিলেশ। অখিলেশের কানে একটা গান আসছে। রবীন্দ্রনাথেরই গান। গানটি ভেসে আসছে হয়তো রেডিয়ো থেকে, অথবা পাশের বাড়িতেই কেউ গাইছে। হয়তো কোনও অনুষ্ঠানে অখিলেশের চোখের সামনেই চলছে সেই গান গাওয়া। আর তারই খুব কাছাকাছি সময়ে গানটি শোনার প্রায় পরে-পরেই, অখিলেশের জীবনে ঘটে গেল কোনও একটি ঘটনা। হয়তো তা দুঃখদায়ী। হয়তো সুখাবহ। ঘটনাটি ঘটল। এবং সেই ঘটনার দশ বা পনেরো বছর পরে, যখন আবারও কোনওভাবে কানে এল সেই গান, তখন জীবন্ত হয়ে উঠল সেই ঘটনার স্মৃতি— হয় দুঃখস্মৃতি, নয়তো আনন্দ-রোমাঞ্চ। মনের মধ্যে ফিরে এল সেই বিশেষ ঘটনা। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গান অখিলেশের প্রিয় গান বা নিজের গান হয়ে ওঠে।

যেমন অখিলেশের যখন আট বছর বয়স তখন অখিলেশের বাবা একটি নদীর সামনে এক বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে গাইছিলেন, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া/ দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।' নদীটির নাম চুর্ণী। শৈশবে, অখিলেশদের বাড়ি ছিল যে -ছোট্ট মফস্‌সল টাউনে তার পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে চুর্ণী নদী। বাবা যে-দিন গানটি গাইছিলেন, সেদিন চুর্ণী নদী দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছিল একটি বড় নৌকো— পাল তোলা নৌকো। বাবা বুঝিয়ে বলেছিলেন ওই ধরনের নৌকায় সাধারণত বালি চালান যায়। আট বছরের বালকটি সেদিন বাবাকে প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছিল তরণী মানে নৌকো আর ধবল মানে সাদা। অমল কথাটি নিয়ে কোনও দন্দ জাগেনি ছোট্ট অখিলেশের মনে, কারণ বিকেলে পাড়ার মাঠে সব পেয়েছির আসরে অখিলেশের মতো আরও অনেক বালককে ড্রিল আর ব্রতচারী শেখায় যে-যুবকটি তাকে সবাই অমলদা বলে ডাকে। বাল্যকালে দাঁড়ানো অখিলেশের মন এককরকম করে কিছু ধারণা করে নিয়েছিল অমল ধবল পাল-এর সঙ্গে নৌকা বেয়ে চলার। অখিলেশের বাবার গান গাইতে কোনও লজ্জা ছিল না। বাড়িতে সারাক্ষণ গান, বাইরে বেরিয়েও ইচ্ছে হলেই গান। সেদিন তাই চুর্ণী নদীর সামনে ওই গান গেয়ে চলেছিলেন অখিলেশের বাবা। বাড়িতে ফিরে এসেও একটা লাইনই বারবার গাইছিলেন, 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া'। গানের ওই লাইনটি অখিলেশের বড় বেশি মনে থেকে যায়।

অখিলেশের ওই আটনছর বয়সেই অখিলেশের বাবা মারা যান। বহুদিন পর্যন্ত ওই গানটি শুনলেই অখিলেশের মনে পড়ত বাবার সঙ্গে চুর্ণী নদীর পাশে বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকার কথা। নদীর মধ্যে ভেসে চলেছে একটি বড় পালতোলা নৌকা। ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। এই

একটিমাত্র ছবিই গানটি শুনলে ফিরে ফিরে আসত অখিলেশের চোখের সামনে।

অখিলেশের প্রথম যৌবনে অখিলেশের জীবনে প্রেম এল। তখন অখিলেশের কবিতা বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে যথেষ্ট পরিমাণে ছাপা হতে শুরু করেছে। লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত দুই সখী একবার খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হল কলকাতা থেকে প্রায় যাট কিলোমিটার দূরে অখিলেশের ছোট্ট মফস্সল টাউনের বাড়িতে। দুই সখীই কলকাতা শহরের বাসিন্দা। একদিন একক কবিতা পাঠ করে শোনাতে হবে অখিলেশকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে। অখিলেশের রাজি হতে কোনও দ্বিধা ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকরাও অনেকে সেই কবিতাপাঠ শুনতে উপস্থিত হলেন। কবিতাপাঠ ভালয় ভালয় মিটে গেল। কিন্তু বিষয়টি সেখানেই থামল না। এই কবিতাপাঠ করতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা অখিলেশের জীবনে নিয়ে এল প্রেম। দুই সখীর একজনের প্রেমে তখন অস্থির হয়ে উঠল অখিলেশ। কলকাতা শহরে, সেই প্রেমের টানে, তখন প্রায়ই ছুটতে হয় যুবক অখিলেশকে। দুই সখীর একজনের বাড়ি উত্তর কলকাতায়। তিনতলার একটি ঘরে দুই সখীর সঙ্গে অখিলেশের দেখাসাক্ষাৎ হয়। দু'জনের মধ্যে যার প্রতি অখিলেশের প্রেম, সে একদিন ছত্র নামছে তিনতলার সিঁড়ি দিয়ে, পিছনে পিছনে তাকে অনুসরণরত অখিলেশের চোখে পড়ছে সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলার গতিবেগে উড়তে উড়তে চলেছে সেই তরুণীর শাড়ির আঁচল। আর তখনই, একতলার যারা আচেনা ভাড়াটে, তাদের রেডিয়োতে বাজছে গান: 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।'

চুর্ণী নদীতীরে দাঁড়িয়ে বাবার গান গাওয়ার ছবির সঙ্গে তখন যুক্ত হয়ে গেল ওই উড়ন্ত আঁচলের তরুণী। বাবার গান গাওয়ার স্মৃতিকে ছাপিয়ে অখিলেশের মনে ভেসে চলতে লাগল ওই তরুণীর দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নেমে চলা আর উড়তে থাকা আঁচল।

তরুণীর একজন প্রেমিক ছিলেন। তরুণী সেকথা প্রকাশ করেনি অখিলেশের কাছে। অখিলেশের প্রণয়-প্রস্তাবে, তরুণী হ্যাঁ-ও বলেনি না-ও বলেনি। নির্দিষ্ট দিনের দেখাসাক্ষাৎ শেষ হলে সেই তরুণী অখিলেশকে ট্রেনে তুলে দিতে আসত। তখন প্রশ্ন করত, "আবার কবে দেখা হচ্ছে?" তরুণী হ্যাঁ-ও বলেনি না-ও বলেনি, কিন্তু যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়িয়েছে অখিলেশের সঙ্গে। হেঁটেছে কলকাতা শহরের মাইলের পর মাইল। ফলে অখিলেশের ধারণা জন্মে গিয়েছিল এই মেয়েই বুঝি তার প্রেমিকা।

তিনমাসের মধ্যেই সেই প্রেমে যবনিকাপাত ঘটল। তরুণীর আসল প্রেমিক আত্মপ্রকাশ করলেন। অখিলেশকে ফিরে যেতে হল কলকাতা থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার দূরের সেই ছোট্ট মফস্সলে। সেসব তিরিশ বছরেরও বেশি আগের কথা। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে একটি এবং দশ বছর পরে আর একটি বই বেরোয় অখিলেশের, যার মধ্যে এই অভিজ্ঞতার রূপালেখ্য ছিল।

এখন গত ছাব্বিশ বছর ধরে অখিলেশ কলকাতা শহরের অধিবাসী হয়েছেন। ইতিমধ্যে অখিলেশের সংসার হয়েছে। সেই সংসারে কয়েকবছর হল আসা-যাওয়া শুরু করেছে ও। ও যখন একলা ঘরে অথবা লোকজনের মাঝখানে অখিলেশের দিকে ভরা চাহনি মেলে তাকায়, অখিলেশের মন বলে ওঠে, "দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।"

অর্থাৎ অখিলেশের কাছে রবীন্দ্রনাথের একই গান বিভিন্ন সময়ে আর বিভিন্ন বয়সে জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তান্তকে মনে করিয়ে দেয়।

একদিন অখিলেশ খুব অবাক হয়ে গেলেন যখন ওর মুখে জানতে পারলেন রবীন্দ্রনাথের গানকে কীভাবে ব্যাখ্যে ও। দু'জনে মুখোমুখি বসেছেন। মাঝখানের একটি ছোট্ট টেবিলে খোলা গীতবিতান। ও বলে যাচ্ছে, অখিলেশ শুনছেন। ও বলছে, "আমি নজর করে করে দেখি, গানের কথার সঙ্গে সুর কীরকমভাবে আসছে। যেমন ধরুন, 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো'— এই গানটি শুনেছেন তো?"

অখিলেশ বলেন, "হ্যাঁ, এ গান তো সবাই শুনেছি আমরা।"

ওর মুখ চোখ অন্যরকম হয়ে যায়। বলে, "কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন— এই গানের আরম্ভের সুর যেন পাতালের কাছ থেকে আসছে। 'অন্ধকারের উৎস হতে' এই জায়গাটি সুরের দিক দিয়েও যেন সেরকমভাবেই রাখা আছে। মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চমে এই জায়গাটি দাঁড়িয়ে। এইটাই, অর্থাৎ মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চমই যেন আরম্ভের বিন্দু। ফলে, মনে হচ্ছে অন্ধকার যেন গাঢ়, একেবারে অতল সেই অন্ধকার। কারণ, উৎস কথাটা আছে তো। অন্ধকারের উৎস, সে তো অতলেই হবে। তাই না? এর ঠিক পরেই আছে 'উৎসারিত আলো'। এর সুর কোথায় পৌঁছল? মধ্যসপ্তকের নি নি ধা নি সা-তে। সব স্বর শুদ্ধ," বলে ও একটু থামল। নিচু গলায় গুনগুন করে গাইল লাইনটা। আবার একটু থামল। যেন চোখের সামনে ঘটতে দেখছে জিনিসটাকে। ও যখন এরকম করে গান নিয়ে কথা বলে, ওর মুখের ভাষাও কেমন যেন বদলে যায়। কেমন অন্যরকম একটা ভাষায় ও বলে গানের বিষয়ে। বলল, "গানের এই একটিমাত্র লাইনের মধ্যে দেখুন কী কাণ্ড ঘটল! ভূমিগর্ভ থেকে আলোর উৎসারণ ছিটকে উঠে গেল উর্ধ্বে— বিদ্যুতের একটা ঝলক যেন, মাটির তলা থেকে আকাশে উঠে গেল মুহূর্তে। মাত্র একটি লাইনের সুরের মধ্যেই কী এক আশ্চর্য কাব্য আত্মপ্রকাশ করল। কী বলবেন একে? সুরের কবিতা?"

অখিলেশ নিরুত্তর থেকে যান। ওদিকে ওকে যেন ভূতে ভর করেছে, ও বলেই চলে, "'আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সে কি,/ অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি'। এই গানে 'আমার প্রাণে গভীর গোপন'— মধ্যসপ্তকে রয়েছে। তারপরেই 'মহা-আপন সে কি'। 'মহা-আপন' তো, এই দেখুন মহা আর আপনের মাঝখানে একটা হাইফেন দেওয়া আছে— অর্থাৎ সে তো আমার চেয়ে অনেক অনেক বড়, বৃহৎ। তাই সে আমারই প্রাণে আছে কিন্তু গভীর আর গোপন হয়ে আছে। 'মহা' কথাটি আচমকা মন্দ্রসপ্তকের শুদ্ধ নিষাদে চলে এল। একেবারে গভীরে। আবারও ওই আগের গানের লাইনটির মতো অতলে যাওয়ার টান। দ্বিতীয় লাইন— 'অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি'। এখানে আছে আরও আশ্চর্য ব্যাপার," ও একটু থামল। আবার চাপা গলায় গুনগুন করে গাইল লাইনটিকে। গেয়ে আবার থামল। কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, "'হঠাৎ তারে দেখি'— 'হঠাৎ তারে'— এখানে যেন সুর চলে গেল আকাশচূড়ায়— মধ্যসপ্তকের পঞ্চম থেকে তারসপ্তকের শুদ্ধ রে ছুঁয়ে কোমল গান্ধার পর্যন্ত চলাচল করল সুর। তারপরই আবার অতলে তার দেখা পাওয়া। সেই মহা-আপনের একবালক দেখা পাওয়ার পর একটু যেন শান্তি। এই 'দেখি' কথাটা লক্ষ করুন।" বলতে বলতে আবার গুনগুন করে গান শুরু করল ও। পরক্ষণেই থেমে গিয়ে বলল, "'দেখি' এই সুরটা কেমন দেখুন, মন্দ্রসপ্তকের কোমল নি, তারপরেই মধ্যসপ্তকের ষড়জ। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে যেমন আছে। রানি সুদর্শনা হঠাৎ যেন অন্ধকারের রাজাকে দেখতে পেল। সুর কোথায় উঠে গিয়ে আবার কতখানি নেমে এল দেখুন। শেষে মধ্যসপ্তকের ষড়জে পৌঁছে দিলেন তো রবীন্দ্রনাথ।"

ও গান শিখেছিল কিশোরী বয়সে, ওর মুখেই সে কথা একবার শুনেছিলেন অখিলেশ। কিন্তু গাইতে বলেনি কিছুতেই গাইবে না। বলবে, আমি গান জানি না। গলা সাধি না কতবছর। নিজের মনে এখন কোনও একটা সুর গুনগুন করতে করতে এলোমেলোভাবে পাতা উলটে যাচ্ছে গীতবিতানের। আচমকা থেমে পড়ল। বলল, "আনুসিংহের পদাবলী থেকে এই লাইনটা যদি দ্যাখেন, এই যে 'আজু, সখি, মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু'— এর সুরটি কেমন? এখানেও একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটছে," বলে নিজের মনেই একটু হাসল। "দেখুন, 'কুহু কুহু'-তে একেবারে চড়ায়। মনে খটকা লাগে না, এত চড়ায় গেলেন কেন রবীন্দ্রনাথ? দ্বিতীয় 'কুহু'তে তারসপ্তকের ষড়জ গান্ধার মধ্যম রে ছুয়ে একেবারে পঞ্চম পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে সুর। কেন তারসপ্তকের পঞ্চম লাগল এই কুহুতে? কারণ, আমরা শুনেছি কোকিলের ডাকই তো পঞ্চম। কোকিল তো পঞ্চমে ডাকে। কোকিলের বারংবার ডেকে ওঠায় যে-তীব্র

বেদনা, যে-বিরহের তীব্র বিঁধছে, সেই বিদ্ধতার যেন একটা চরম প্রকাশ ওই দ্বিতীয় 'কুহু'-তে তারসপ্তকের পঞ্চম লাগানো। অবাক করা ব্যাপার এটাই যে, শুধু গানের কথায় নয়, সুরের দিক দিয়েও সেটা ঘটল। এটাই আমার কাছে সুরের কবিতা।"

আজ গানে পেয়েছে ওকে। গীতবিতান বন্ধ করে রেখে বলল, "সত্যি অনেকক্ষণ বকবক করলাম। কিন্তু কী জানেন, এই চিন্তাগুলো একবার মাথায় ঢুকলে আর বেরোতে চায় না। যেমন এক্ষুনি মনে পড়ছে 'শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে', এই একটা মাত্র লাইনই যদি ধরি তা হলে কী দেখব? 'রেশ' কথাটার মধ্যে একটা কড়ি মা বসিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ," বলেই ও থেমে গেল। আর গুনগুনও করছে না। কিন্তু ওর চোখ অসম্ভব অন্যমনস্ক। যেন ও এখানে এ ঘরে নেই। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, "যেন উনি বলছেন এই তীব্র মধ্যমটুকু ছাড়া আমার আর কিছু নেই। ও-ই 'রেশ'। 'রেশ'-এ ওই স্বর। তীব্র মা। ওই স্বর যেন ছুরির মতো একটা বিষাদকে বিঁধিয়ে দেয়। চলে যাওয়ার জন্য আর কিছু যেন দেওয়ার নেই।"

এইসময় অলকা চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। আজকে কোনও তাড়াহুড়ো করছে না ও। আজকে চা খেতে আপত্তিও করল না। ওর মুখ আবার সেরকম আলো-আলো হয়ে উঠেছে।

অখিলেশ ভাবছেন, সামনে যে-মেয়েটি বসে আছে, তাকে কি অখিলেশ চেনেন? এমন গভীরে করে সুর নিয়ে, বাণী নিয়ে ভাবতে পারে যে-মেয়ে তাকে তো তিনি রোজই প্রায় দ্যাখেন। কই, এই পরিচয় তো কখনও পাননি!

অখিলেশ বলেন, "রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কখনও এভাবে ভাবতে পারিনি। আপনি গান শিখেছিলেন বলেই হয়তো এভাবে ভাবতে জানেন!"

ও একটু আনমনাভাবে বলে, "না-আ, জানেন। যাঁদের কাছে গান শিখেছি তাঁরা স্বরলিপির দিকে মন দিতে বলতেন। স্বরলিপিকে নির্ভুলভাবে অনুসরণ করতে বলতেন। স্বরলিপি পড়তে শেখাতেন। এদিকে স্বরলিপি পড়তে শিখে আমি স্বরের সঙ্গে কথার একটা সম্পর্ককে আন্দাজ করার চেষ্টা করতাম। তারপর তো সব..."

ও থেমে গেল।

অখিলেশ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন, "তারপর? তারপর কী হল?"

ও হাসল। সেইরকম হাসি যা ঘরকে আলো করে দেয় না। যে-হাসি প্রায় নিঃশব্দ কান্নার মতো। ও যখন একেবারে প্রথম প্রথম অখিলেশের কাছে আসত, তখন এইরকম হাসি দেখা যেত ওর মুখে। বিষাদ আর ব্যর্থতার ভারে ক্লান্ত একরকম হাসি।

অখিলেশ আবার বলেন, "কী হল তারপর? আপনার গানের কী হল? গান গাইলেন না কেন আর?"

আবার তেমন করে হাসল ও, যা কান্নার চেয়ে বেশি। বলল, "কী করব বলুন, তারপর প্রেমে পড়লাম যে। একদিকে পড়াশোনা, অন্যদিকে প্রেম। গান বন্ধ হয়ে গেল।"

অখিলেশ বললেন, "কেন, গান ছেড়ে দেওয়ার কী হল?"

ও তেমনই ম্লান হেসে বলল, "তারপর কী কী হল আপনি তো সব জানেন। সবই তো বলেছি আপনাকে," বলেই চায়ের কাপ আবার তুলে নিল ঠোঁটের কাছে।

অখিলেশ ভাবলেন, হ্যাঁ, অখিলেশ জানেন বটে। ওর কাছে সবই শুনেছেন।

ও বলল, "গানের ভূতটা এক-একদিন মাথায় চেপে বসে। তখন অনেক আজেবাজে কথা বলে চলি। আজ আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।"

অখিলেশ বলেন, "একটা অনুরোধ রাখবেন?"

ও বলে, "এভাবে বলবেন না। আপনি আদেশ করবেন।"

অখিলেশ বলে, "আদেশ করতে আমি পারি না। কাউকেই কখনও আদেশ করতে পারি না। বলছিলাম, আজকে আমাকে যে-কথাগুলি বললেন, এরকম আরও অনেক কথা তো আপনার মনের ভেতর জমা আছে? রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে?"

ও বলে, "কিছু কিছু ভেবেছি। তবে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনার সঙ্গে একটা বা দুটো গান জড়িয়ে আছে বলেই সেই গান যে আমার কাছে প্রাধান্য পায়, তা নয় সবসময়। রবীন্দ্রনাথ তো আমার কাছে এক মহা-আপন। শুধু আপন নন। কোথাও কোথাও মহা-আপন। তাই তাঁর গানটি নিজে কী বলছে— আমার জীবনসংক্রান্ত ঘটনা বাদ দিয়ে কী বলছে তার নিজের কথা দিয়ে সুর দিয়েও, সেটা মাঝে মাঝে ভাববার চেষ্টা করি।"

বাইরের বারান্দা থেকে ওয়াশিং মেশিন চলার আওয়াজ ভেসে আসছে ঘরে। একটু আগে পশ্চিমের জানলা দিয়ে যে-রোদ পড়েছিল ওর মুখে সেই রোদ্দুরও সরে গেছে বেশ অনেকক্ষণ। বিকেল এখন সন্ধ্যার প্রান্তে মিশতে চলেছে।

অখিলেশ বলেন, "ভাববার চেষ্টা তো করেন, তাই না? আজকে আমাকে তার দু'-তিনটি ভাবনা বললেন। এই ভাবনাগুলিকে এবার থেকে লিখতে শুরু করুন না! খুব ভাল লেখা হবে।"

"কী বললেন? লেখা?" ও হঠাৎ অন্যরকম হাসিতে ভেঙে পড়ল।

অখিলেশ অপ্রতিভ। বলেন, "খুব হাসির কথা বলেছি কি?"

ও বলে, "আমার পক্ষে হাসির কথাই বটে। লেখা আমার দ্বারা হবে না। স্টুডেন্টদের পড়ানো নিয়েই শুধু ভাবি। ভাবি, পরের দিনের ক্লাসটা যেন ভালভাবে নিতে পারি। লেখার কথা ভাবিই না।"

অখিলেশ যেন শেষ চেষ্টা করেন, "কেন? ভাবেন না কেন?"

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ও উঠে দাঁড়ায়।

অখিলেশ বলে, "চলে যাচ্ছেন? এক্ষুনি?" অখিলেশের গলা কাতর শোনায়।

ও হাসে, বলে, "আজকের মতো উঠছি। আবার তো আসব। চলে যাচ্ছেন আবার কী ধরনের কথা?"

ওড়নার বাঁ কাঁধের দিকটা হাত তুলে ঠিক করে বলে, "শুনুন, আপনারা লিখবেন, আর আমরা পড়ব। সবাই কি লিখতে জানে? যাই, চুলটা আঁচড়ে আসি।"

ব্যাগটা তুলে বাথরুমের দিকে যায় ও, অখিলেশ বসে থাকেন।

অখিলেশ আজকেও বসে আছেন। একা। বাইরের ঘরে। ভাবছেন, সেদিন বলেছিল, আবার তো আসব। বলেছিল, আপনি তো সব জানেন। কিন্তু সত্যি সত্যি সব কি আর জানেন অখিলেশ? কিছু কিছু জেনেই ভেবে নিয়েছিলেন, সবই নিশ্চয় জানি ওর কথা। ওই গানের নির্ভুত বিশ্লেষণের কথা যেমন ওর গভীরতর মনে লুকনো ছিল, অখিলেশকে ছেড়ে যাওয়ার কথাও তেমনই ছিল আড়ালে। অন্তত অখিলেশের জানাশোনার আড়ালে।

আজ অখিলেশ ওর দ্বারা পরিত্যক্ত। সেই ঘরটাতেই এখন বসে আছেন অখিলেশ, যে-ঘরে ওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলে গিয়েছেন। আজকেও স্ত্রী এবং কন্যা কেউই বাড়িতে নেই। অখিলেশ বসে বসে দিন গুনে চলেছেন। এই নিয়ে দু'শো তিরাশি দিন হল। দেখা না হওয়ার দিন।

আট

হ্যাঁ, জানেন বটে অখিলেশ। ওর সব কথা জানেন। অন্তত ও নিজের জীবন সম্পর্কে অখিলেশকে যা যা বলেছিল সবই অখিলেশ চোখ বুজে বিশ্বাস করেছেন। ও যখন প্রথম এসেছিল, তখন ওর মুখে ছিল গাঢ় ম্লানতার এক ছায়া। ছিল গভীর এক বিষাদ। তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি। সে ছিল একেবারে প্রথম দিনটির কথা। তারও পরে, প্রথম-প্রথম, ও যখন আসত ওর মুখে সেই বিষাদ-ম্লান ছায়াটি থাকতই। অখিলেশ সে-সময়টা ঠিক বুঝতে পারতেন না ও কেন অখিলেশের কাছে আসে। কেন? অখিলেশের জন্য বই কিনে আনতে চায় কেন? কিন্তু দিনে দিনে ওর বিষয়ে একটা টান অনুভব করতে শুরু করলেন অখিলেশ। ওর মুখে সেসব দিনে এখনকার মতো আলো-

আলো ভাব থাকত না। ও একটা কলেজে পড়ায়। সরকারি কলেজ। কিন্তু ও নিজেকে বলত ব্যর্থ। বলত, "আপনার মতো মানুষের একটা-দুটো কাজে সাহায্য করতে পারি, এতেই আমি ধন্য।" বলত, "এই বই কিনে আনার সুযোগটুকু আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না।" অখিলেশ বুঝতে পারতেন না, কী এমন মানুষ তিনি নিজে! কবিতা লেখেন বটে, ছাপাও হয়, বইও বেরোয়। তার ফলে তো কোনও মানুষের কোনও উপকার হয় না। কিন্তু কলেজে পড়ালে, দু'-চার জন ছাত্রছাত্রীকেও তো তৈরি করা যায়। প্রতি বছর দু'-তিনজন করে ছাত্রকে তৈরি করতে পারলে সমাজের তো উপকার করাই হয়। মাঝে মাঝে বলত, "আগামী কাল দুপুরে দুটো ক্লাস আছে। আজ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ব। একটু পড়াশোনা করতে হবে।" কখনও কখনও একথাও বলত, "আপনি আমাকে একটুও বকেন না কেন?" অখিলেশ অবাক হয়ে বলতেন, "হঠাৎ বকবি করব? কী কারণ আছে তার?"

ও বলত, "আমি একদম পড়াশোনা করছি না। আপনার এখান থেকে বাড়ি গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ি। বইপত্র খুলি-ই না। আপনাকে বলে রাখলাম, আপনি আমাকে মাঝে মাঝে বকবেন, কেমন?"

অখিলেশ প্রায় কিছুই বুঝতে পারতেন না এসব কথার মানে—কিন্তু ক্রমেই গভীর গভীরতর এক টান বোধ করতেন, ওর সম্পর্কে। উলটোদিক থেকে ওর-ও সেইরকম একটা টান যে জন্মেছে, সে কথা একটু একটু বুঝতেও যেন পারতেন অখিলেশ, তবু বিশ্বাস করতে যেন ভরসা হত না। অখিলেশের বাইরের ঘরে বসে ও আবার একদিন বলল, "আমার জীবনটা তো ব্যর্থ। আপনার মতো মানুষের লেখা কপি করে দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, এটাকেই সৌভাগ্য বলে মানি।"

তখন সন্দ-সন্দই অখিলেশের চোখের অসুবিধে ধরা পড়েছে আর ও এসে অখিলেশের মুখে মুখে বলে যাওয়া কবিতা কপি করে দিচ্ছে।

অখিলেশ বলেন একদিন, "আপনি কেন নিজের জীবনকে ব্যর্থ বলেন বারবার? একথা ঠিক নয়।" ও বলেছিল, "ঠিক কি ভুল আপনি বুঝবেন কী করে বলুন? আপনি তো আমার জীবনটা কীরকম সে কথা জানেন না! বলব একদিন আপনাকে? শুনবেন?"

অখিলেশ বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই শুনব।"

সেই বিষাদময় মুখে সামান্য আলোর ছাপ দেখা গিয়েছিল। ও বলেছিল, "ঠি-ই-ক?"

অখিলেশের জেদ চেপে গিয়েছিল, "বলছি তো ঠিক। বেশ, আজকেই শুনব। আর দেরি করতে চাই না। আপনি বলুন তো কী কারণে বারবার আপনি নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ বলেন?"

তখন বিকেল হয়ে আসছে। পশ্চিমের জানলা দিয়ে হেলে পড়া রোদ। অন্যান্য দিনের মতো আজ আবারও এসে পড়েছে ওর মুখে। ও বলল, "এখন? মানে আজকে? আজকে কী করে হবে? এখন তো আপনি লেখা বলবেন। আমাকে তো কপি করতে হবে!"

অখিলেশ খানিকটা অধৈর্য হয়েই বলেছিলেন, "আজকে আর মাথায় লেখা আসবে না। আপনি বলুন তো আপনার কথা। আজকে আপনার কথা শোনাটাই আমার কাজ। লেখা পরের দিন দেখা যাবে।"

ও চুপ করে বসে খাতা বন্ধ করে মলাটের উপর আঁকিবুকি কাটছে। অখিলেশ আবারও বললেন, "বলুন সব আমাকে, চুপ করে থাকবেন না। আমি শুনতে চাই।"

ওর মুখে আবার ম্লানতার ছায়া পড়ল।

সেদিন খাতার মলাটে আঁকিবুকি কাটতে কাটতেই কথা শুরু করেছিল মাথা নিচু করে। কথা শেষ করতেও খুব বেশি সময় নেয়নি।

অখিলেশ জেনেছিলেন ওর সাম্প্রতিক জীবনবৃত্তান্তের কিছুটা আর বুঝেছিলেন নিজের সম্পর্কে ওর সমূহ ব্যর্থতাবোধ প্রধানত প্রেম-কেন্দ্রিক। ও কলেজে পড়তে পড়তে এক সহপাঠীর সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হয়। সেই প্রেমে ও এতটা সময় আর মন ব্যয় করে যে, ওর রেজাল্ট যতটা ভাল হবে আশা করা গিয়েছিল, ততটা ভাল হয়নি। কিন্তু ওর সহপাঠী সতর্ক ছিল পড়াশোনার বিষয়ে এবং সহপাঠীর পরীক্ষার ফল অনেক উজ্জ্বলতর হয়। ওর বক্তব্য, সহপাঠী ওর মতো প্রেমে একেবারে ভেসে যায়নি। নিজের কাজের দিকে সহপাঠী সবসময় নজর রেখেছিল, যা ও রাখেনি। তারপর ওরা দু'জনেই চাকরি পেয়ে যায় ও সহপাঠী। সহপাঠী খুব বুমুমাম করেই হয়। ওর বাবা যথেষ্ট খরচ করেন এবং সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মান্য করে বিবাহ দেন। যদিও ওর বাবা এবং মায়ের দু'জনেরই এই বিয়েতে ঘোরতর অমত ছিল— কিন্তু মেয়ের প্রবল জেদের সামনে দু'জনেই হার স্বীকার করে নেন। ও তখন একটি কলেজে পড়াচ্ছে এবং ওর স্বামীও অন্যত্র চাকরি করছে।

এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। ও তখন যে-কলেজে পড়াচ্ছে, সেখানে একজন সিনিয়র প্রফেসর ছিলেন। ওর ডিপার্টমেন্টের তিনি প্রধান। যাকে বলে এইচওডি। মধ্যবয়স অতিক্রম করেছেন তিনি। এখন সৌম্য শান্ত প্রৌঢ়তার আশ্রয়ে আছেন। বিয়ের পর একবছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই প্রফেসরের সঙ্গে গভীর প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ল ও। দিনরাত্রি একাকার করা সেই প্রণয়সম্পর্ক— দু'জনেরই দু'জনের প্রতি চূড়ান্ত টান। ও অখিলেশকে পরে একটি মেসেজে জানায়, স্যার আমাকে গভীরতমভাবে স্পর্শ করেছিলেন। ও সর্বদা সেই প্রফেসরকে স্যার নামে অভিহিত করত। স্যার-এর আসল নাম কী ছিল কখনওই জানতে পারেননি অখিলেশ। জানতে চানওনি।

ওর জীবনবৃত্তান্তের এই জায়গায় এসে, ওর মুখের বিষাদঘন ছায়া আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। ওর বলে চলার পুরো সময়টা অখিলেশ কোনও প্রশ্ন করেননি। এমনকী, একটা 'তারপর' পর্যন্ত বলেননি অখিলেশ। সম্পূর্ণ নিঃশব্দ ছিলেন।

ও খাতায় আঁকিবুঁকি কাটা থামিয়ে দিয়ে কথা বলতে বলতে খাতাটি কোলের উপর রেখে আপনমনে মলাটের ওপর হাত বোলাচ্ছিল। আবার আপনমনেই কথা শুরু করছিল। গলার স্বর নম্র, নিচু। কখনও কখনও চোখ তুলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কথা বলছে, কখনও বা খোলা জানলার বাইরে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে চুপ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে অলকা এসে দু'জনকে দু'কাপ চা আর ছোট্ট দু'টি বাটি করে চিঁড়েভাজা দিয়ে গিয়েছে। সুরমা আজকেও বাড়িতে নেই। দুবাই থেকে সুরমার বউদি এসে উঠেছেন নিউ আলিপুরে। সেখানে দেখা করতে গিয়েছেন সুরমা। এদিকে দু'জনের চায়ের কাপ দু'জনেরই সামনে পড়ে আছে।

ওর আর অখিলেশের কারওরই চায়ের কথা মনে নেই। ওর কথায় জানা গেল, স্যার প্রবলভাবে সাড়া দিয়েছিলেন ওর প্রেমে। দু'জনের মধ্যে ডিপার্টমেন্টে রোজই দেখা হলে ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও দু'জনের অনেকক্ষণ কেটে যেত ফাঁকা ঘরে। কখনও কখনও বাইরের কোনও রেস্তরাঁয় দেখা হত। কিন্তু প্রধান যোগাযোগটা ছিল মোবাইল-এর মেসেজে। ও সারাদিন ধরে স্যারকে মেসেজ করে চলত, স্যারও প্রত্যেকটারই উত্তর দিয়ে চলতেন। কখনও কখনও একটি মেসেজের একাধিক উত্তরও পেয়েছে ও। তা ছাড়া স্যার নিজে থেকেও মেসেজ করতেন প্রায়ই। তবে ওর মেসেজ ছিল সংখ্যায় বেশি, সে কথা স্বীকার করল নিজেই।

একদিন সেই প্রফেসরের একটা মেসেজ এসে পৌঁছল, যখন ও কলেজে বেরোবে বলে স্নান করতে গিয়েছে। ওর মোবাইল ফোন ড্রেসিং টেবিলে রাখা। ও স্নান সেরে বেরিয়ে দেখল ওর স্বামী অফিসে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েও তখনও বেরোয়নি। ওদের বিয়েতে ওর বাবা যে ডবল-বেড খাট দিয়েছিলেন, তার উপর চুপ করে বসে আছে। স্বামীর হাতে ধরা ওর মোবাইল ফোন। ও তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল আর ওর স্বামী ওর মোবাইল ফোনটা 'এই নাও' বলে ওর হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চুপচাপ। ফোন হাতে নিয়ে ও দেখল সেখানে স্যারের মেসেজ। গভীর প্রণয়পূর্ণ কথায় ভরা সেই মেসেজ। ডিপার্টমেন্টে কখন দেখা হবে সে-অধীরতাও আছে। আছে kiss বা চুম্বনও।

এমন মেসেজ বিনিময় ছিল দু'জনের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু ওইদিন হঠাৎ সেরকম মেসেজ স্বামীর হাতে পড়ে যাওয়ার পর বিষয়টি আর স্বাভাবিক রইল না। ওর স্বামী সেই প্রফেসরের সঙ্গে দেখা

করল। প্রফেসরের স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করল। প্রফেসর ওর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ সরে এলেন এবং আর কোনও যোগাযোগ করতে বারণ করলেন। খুবই ক্রুভাবে ওকে সরিয়ে দিলেন বলা যায়, কারণ, ওই স্যারকে ক্ষমা চাইতে হল ওর স্বামীর কাছে এবং ওকে স্যারের বাড়ি গিয়ে মার্জনা চাইতে হল স্যারের স্ত্রীর কাছে। ওই একই ডিপার্টমেন্টে যেতে হচ্ছে, রোজই দেখা হচ্ছে, তবু এই স্যার যেন মাত্র একদিনের ব্যবধানে পুরো এক আলাদা মানুষ হয়ে গিয়েছেন। আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এই স্যার কঠোর, কঠিন, নৈর্ব্যক্তিক। মুখের দিকে তাকান না। কথাও বলেন না। ডিপার্টমেন্টে যাওয়াটাই ওর পক্ষে একটা শাস্তি তখন। কারণ, ও তো মন থেকে স্যারকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারছে না—স্যার যেটা প্রত্যেকদিন।

এইসময় ওর বদলির অর্ডার বেরোল। ও যেন সাময়িকভাবে বেঁচে গেল। প্রত্যেকদিন আর স্যারের মুখোমুখি হতে হবে না। ওর ভিতরটা যেমন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল প্রত্যেকদিন ডিপার্টমেন্টে গিয়ে, তার হাত থেকে ও রেহাই পেতে চলেছে এটা ঠিক কথা, কিন্তু এত বড় একটা ঘটনা যে ওর জীবনে ঘটে গিয়েছে— ও যে স্যারের কাছ থেকে একটা অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়েছে— সে কথা তো ও কাউকে বলতে পারেনি। ওর ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। তখন ওদেরই কলেজে, ওদেরই ইয়ারের মেয়ে, যে ওদের সঙ্গে একই বছরে পাশ করে বেরিয়েছে তবে অন্য সাবজেক্টের ছাত্রী — তার কাছে গিয়ে ও সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

অখিলেশের ঘরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে কিছুক্ষণ হল। অলকা এসে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। অখিলেশের বাড়ির গলি দিয়ে প্রতিদিনের মতো ঘুমঘুমি বাজিয়ে ঘো-ও-টি-ই-গরম হেঁকে যাচ্ছে ঘটিগরমওয়ালা। ও কিছুক্ষণের জন্য চুপ করেছে। ওর কথা বলা আর চুপ করে থাকা প্রায় সমানে সমানে চলেছে এতক্ষণ। নিজের মনে, প্রায় স্বগতোক্তির মতো ও বলে গেছে সব। এবার অখিলেশ বললেন, "চিঁড়েভাজা তো ঠান্ডা হয়ে গেছে। খাবেন কী করে? আমি বরং অলকাকে নতুন করে আর-একবার ভেজে দিতে বলি?"

অখিলেশের কথাটা ওর কানে ঢুকল বলে মনে হল না। ওই ঠান্ডা চিঁড়েভাজাই বাটি থেকে হাতে ঢেলে নিয়ে চিবোতে লাগল কোনও উত্তর না দিয়ে। তারপর ওই একইরকম স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলল, "অন্তরা সাইকোলজি পড়াত। সপ্তাহে তিনদিন করে একটা ক্লিনিকে বসে কাউন্সেলিং করত। ইনফ্যাক্ট, এখনও করে। অন্তরার কাছে গিয়ে সেইজন্যই সব খুলে বলেছিলাম। আমার তখন যা মনের অবস্থা ভেবেছিলাম অন্তরার কোনও পরামর্শ হয়তো আমার কাজে লাগবে।"

অখিলেশ বললেন, "কিছু সাহায্য পেলেন ওই অন্তরার কাছে?"

এবারও ও অখিলেশের কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। বলল, "নতুন জায়গায় এসে কাজে যোগ দিলাম। এখন আর স্যারের সঙ্গে দেখা হয় না। কিন্তু অনেকের ফোন পেতে লাগলাম। আমার ব্যাচমেটদের ফোন।"

অখিলেশ অবাক হয়ে বললেন, "ব্যাচমেটদের ফোন? মানে?"

এবারে ও অখিলেশের কথার সরাসরি উত্তর দিল, "মানে অন্তরা, স্যারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা, এবং আমার স্বামীর সঙ্গে কী ট্রাবল হয়েছে তার সমস্তটা— ফোন করে করে— আমাদের সব ব্যাচমেটদের জানিয়েছে। আমি বুঝলাম ঘটনাটা এখন সবাই জানে। আমার স্বামীর কাছেও ফোন আসতে লাগল সহানুভূতি জানিয়ে যাতে আমার স্বামী আরও রেগে উঠতে লাগল। ওদিকে সেই এসএমএস দেখে ফেলার পর থেকে আর আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়নি। ক্ষমা চাওয়া ইত্যাদি ঘটেছে দু'পক্ষেই। কিন্তু আমরা আর স্বাভাবিক হইনি। আর হবও না। কোনওদিন। আমার স্বামী এখনও স্যারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে রোজই নানারকম বাঁকা কথা শোনায়। আমিও একদম কোল্ড হয়ে গেছি ওর বিষয়ে।"

এবার ও একটু থামল। দম নিল যেন। বলল, "বাঁকা কথা শোনাবেই তো! স্যারের দিকে প্রথমে তো আমিই এগিয়েছিলাম। আমার আর স্যারের সম্পর্কটা তো মিথ্যে ছিল না। আমার স্বামী তো কারও কাছে যায়নি। আমিই গিয়েছিলাম। সেইজন্যই আমার স্বামী আমাকে বাঁকা কথা বলে। কিন্তু রোজ একই কথা একই খোঁচা সহ্য করা যায় না আর।"

আবার থামল। লম্বা একটা নিশ্বাস পড়ল। ওর মুখের ওপর সেই বিষাদময় ঘরের টিউবলাইটের আলোয় আরও স্পষ্ট। বলল, "তবে ধরা পড়ে যাওয়ার পরেই যে স্যার ওইভাবে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন সে কথা ভাবতেও পারিনি। এমনকী, অন্তরা আর আমার সব ব্যাচমেটরাও আমাকেই দোষী করেছিল। ওদের কৌতূহল, ওদের মশকরা ফোনের মধ্যে দিয়ে এসে আমার গায়ে জ্বালা ধরায়। তারপরেই ভাবি, দোষী নিশ্চয়ই আমি। নইলে একজনও আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলল না কেন? আমার স্বামীর সঙ্গেও সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেল, আর স্যারের সঙ্গে তো গেলই। সবই আমার জন্য।"

অখিলেশ বললেন, "নিজেকে এইভাবে দোষী করবেন না। প্রেম যখন আসে, তখন কিছু-না জানিয়ে, হঠাৎ ঝড়ের মতো আসে। ওই ঝড় আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর যা যা ঘটেছে তা সবই সামাজিক প্রতিক্রিয়া। এসব ক্ষেত্রে এমনই ঘটে। কতদিন আগের কথা এসব?"

ও বলল,"বেশিদিন নয়। আপনাকে ফোন করার কয়েকমাস আগে। দিল্লিতে একটা সেমিনারে গিয়েছিলাম। অসম্ভব গরম তখন। সেমিনার থেকে বেরিয়ে গেস্ট হাউসের দিকে যাচ্ছি আর ব্যাচমেটদের ফোন আসছে। এইসময়, আপনার একটা বই সঙ্গে ছিল। গেস্ট হাউসে ফিরে গিয়ে বইটা নিয়ে বসলাম। হঠাৎ কী মনে হল, বইটি পড়তে পড়তেই মনে হল, এই মানুষটার কাছে গেলে হয়তো শান্তি পেতে পারি। তারপর কলকাতায় ফিরে, খুব কষ্ট করে, আপনার ফোন নম্বর জোগাড় করলাম।"

অখিলেশের খুব ইচ্ছে করল প্রশ্ন করেন, "আমার কোন বই ছিল আপনার সঙ্গে?" কিন্তু কথাটা আর বলে উঠতে পারলেন না।

বললেন বটে অখিলেশ হঠাৎ ঝড়ের মতো আসে, কিছু না জানিয়ে, প্রেম। কিন্তু জলের মতো তো আসে। বন্যার জল নয়। শান্ত জল। প্রথমে পায়ের পাতাটুকু ডোবায়। তারপর কখন যেন হাঁটু ডুবল। কখন সেই জল কোমর ছাড়িয়ে একেবারে বুক-জল গলা-জল হয়ে গেল। দুটো হাত জলের তলায়। সমস্ত শরীর জলের তলায়, মাথাটুকু শুধু জেগে আছে... এমন অবস্থা কখন ঘটল, কী করে ঘটল, মন তা জানে না, মন তখন ওই গলা-জলেই বাস করতে চায়। সমস্ত অস্তিত্ব যে ডুবে গিয়েছে সে কথা জেনেও সে মনে করে এটাই তার সৌভাগ্য, তার পরম পাওয়া। কীভাবে, দিনে দিনে, সে গলা-জল অবধি ডুবে গেল, তা সে নিজে বুঝতেও পারে না।

বুঝতে পারেননি অখিলেশও। স্থির জলের শান্তি তাঁকে যেন স্নান দিয়েছিল। যে-মেয়ে, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই, স্বামী ঘরে রেখে, ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র প্রফেসরের প্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজে থেকেই, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না— কবে যেন অখিলেশও সুরমাকে ঘরে রেখে, সেই মেয়ের প্রেমে ডুবে গেলেন। কতটা গভীরভাবে যে সেই মেয়ে অখিলেশকে অধিকার করে নিয়েছে, তার কোনও আন্দাজও রইল না অখিলেশের।

নয়

ও একটা ফ্ল্যাট পছন্দ করেছে, এবং একজন প্রোমোটারের সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়েছে ওরা। ওদিকে ব্যাঙ্ক লোন পাওয়ার ব্যাপারেও চেষ্টাচরিত্র করছে— একথা মাঝেমাঝেই অখিলেশ ওর মুখে শুনছিলেন কিছুদিন ধরে। একসময় লোন পেয়ে গেল ব্যাঙ্ক থেকে। একটা ফ্ল্যাটও কিনল। সুরমা আর অখিলেশকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে-ই ফ্ল্যাট দেখাল। ছোট ফ্ল্যাট। একজনের থাকার পক্ষে ভাল। সুন্দর করেই সাজিয়েছে। সুরমা খুব প্রশংসা করলেন। অখিলেশ বললেন, "ভালই তো বেশ।" ফ্ল্যাটের চাবি যেদিন ও পেয়েছিল সেদিন এসে ও হঠাৎ অখিলেশকে

একটা প্রণাম করেছিল। অখিলেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন "প্রণাম নিতে আমার খুব কুণ্ঠা হয়। আমি কি প্রণাম নেওয়ার যোগ্য? তা তো নই।" ও বলেছিল, "একটা প্রণাম করতেও দেবেন না?" প্রত্যেক বছর শিক্ষক দিবসে ও মেসেজে লিখত, "আজকে টিচার্স ডে। আমার প্রণাম নেবেন।" প্রথম বছর এই মেসেজ পাওয়ার পর যখন দেখা হল, অখিলেশ বলেছিলেন,"আপনাকে কিছু শেখাতে পারি সে-যোগ্যতা কি আমার আছে? আমি কোনওভাবেই আপনার শিক্ষক হতে পারি না। শিক্ষক হতে পারেন আপনার সেই স্যার। যাঁর কাছে আপনি পড়েছিলেন, যাঁর সঙ্গে আপনি চাকরিও করেছেন কিছুদিন।"

স্যার কথাটা মুখ ফসকে বলে ফেলেই অখিলেশ বুঝেছেন কাজটা ঠিক হয়নি। ওর মুখে একটা কালো ছায়া পড়ল। ও বলল, "জানেন, এবারও আমি স্যারের জন্মদিনে স্যারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মেসেজ করে বসেছিলাম।"

অখিলেশ এটা আশা করেননি। বললেন, "তাই? তারপর কী হল?"

ও চেষ্টা করল নিজের মুখকে নিরাসক্ত, উদাসীন রাখতে। পারল না। আত্মগ্লানির অন্ধকার ওর মুখ অধিকার করে নিল। নিজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ও বলল, "কেন যে বেহায়ার মতো এখনও মেসেজ করতে গেলাম! না, কোনও উত্তর স্বাভাবিকভাবেই আসেনি।"

অখিলেশ সবসময় চেষ্টা করেন ওই স্যার-সম্পর্কিত ঘটনার জন্য যে-ব্যর্থতাবোধ আর গ্লানি ওর মধ্যে কাজ করে, সেগুলো যেন মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে। এখন অখিলেশ বললেন, "এভাবে আত্মনির্যাতন করবেন না। আপনার মনে হয়েছে আপনি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মিটে গেছে। এর জন্য নিজেকে বেহায় বলার দরকার নেই।"

ও বলে, "জানেন, ওই ঘটনার পর থেকে স্যার নিয়মিত স্যারের স্ত্রীর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে, অথবা রেস্তরাঁয় খেতে গেলে সেসব ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেন। আগে কিন্তু এগুলো করতেন না।"

অখিলেশ বোঝাবার চেষ্টা করেন, "আপনি খুঁজে খুঁজে স্যারের ফেসবুক প্রোফাইল খুলে দেখেন কেন? ওই অভ্যেস আপনার বর্জন করা উচিত। স্যারের জীবন নিজের মতো চলুক না। আপনি ফেসবুক ঘেঁটে ঘেঁটে তার খোঁজ নিতে যান কেন? এর ফলে তো নিজেরই কষ্ট বেড়ে যায়। ওই সময়টা ফেসবুক না করে একটা বই পড়তে পারেন তো!"

ওর মুখে আলো ফিরে এসেছিল, "এ-ই তো! এই জন্যে তো আপনার কাছে আসি আমি। আপনি ঠিক রাস্তাটা বলে দেন। ঠিক, ফেসবুকে আর স্যারের প্রোফাইল সার্চ করব না। মেসেজও করব না আর। মেসেজ করে ফেলার পর থেকে নিজের কাছে নিজেকে এত খারাপ লাগছিল।"

অখিলেশ বলেছিলেন, "যে-কাজ করে ফেললে নিজেকে নিজের কাছে খারাপ লাগে তেমন কাজ না করাই তো ভাল। আর, আবারও বলছি, আপনার নিজেকে খারাপ ভাবার, ব্যর্থ ভাবার কোনও কারণ নেই। আপনি একজন মানুষের প্রেমে পড়েছিলেন। প্রেম তো অন্যায় কাজ নয়। সামাজিক মানুষরা মেনে নিতে পারে না, এই যা।"

ওই যে ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে গেল সুরমা আর অখিলেশকে, তার কয়েকমাস আগেই ও স্বামীর কাছ থেকে সরে এসে একাকী ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করেছিল। প্রত্যেকদিন রাত ন'টা থেকে সাড়ে ন'টার মধ্যে একজন কাজের মেয়ে আসে। সারারাত থাকে, সকালে বিদায় নেয়। কাজের মেয়ে এসে রাতের রুটি, তরকারি, চিকেন রান্না করে। ঘোষ্টা হলে দু'জনে দু'ঘরে শুয়ে পড়ে। খুব সকালে উঠে কাজের মেয়ে ভাত, ডাল, মাছ রান্না করে বেরিয়ে যায়। ও তখন সকালের কফি খাচ্ছে। কফি খেয়ে স্নান করতে যাবে। স্নান সেরে ভাত খেয়ে কলেজে বেরোবে ও। কাজের মেয়ের বর কিছু করে না। তাই কাজের মেয়ে দিনের বেলাও এক বাড়ি রান্না করে।

ও একদিকে একেবারে স্বাধীন হয়ে গেল। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়িকে ছেড়ে এসে একেবারে একা থাকতে শুরু করল। ফেসবুকে স্টেটাস দিল সেপারেটেড। মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সের জন্য কাগজপত্র তৈরি করতে লাগল। এসবের জন্য একজন উকিল তো দরকার। সুরমা-অখিলেশের একজন পরিচিত উকিল আছেন, যিনি এই ধরনের ম্যাট্রিমনিয়াল কেসই শুধু করে থাকেন। মেয়েদের পক্ষ নিয়ে আদালতে সওয়াল করে মেয়েদের ভিতিয়ে আনেন। সুরমা-অখিলেশ এই উকিলের পুত্রের উপনয়নের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। কলকাতার উপকণ্ঠে এক শহরতলিতে উকিলের তিনতলা বাড়িতে গিয়ে উপনয়নের নিমন্ত্রণ রক্ষাও করেছিলেন সুরমা-অখিলেশ। সে বেশ কয়েকবছর আগেকার কথা। অখিলেশের সময়ের অভাব হওয়ায় সুরমাই বললেন, "আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব।" ও সুরমার সঙ্গেই একদিন গিয়ে উকিলের সঙ্গে পরিচিত হল। নিরঙ্কুশ স্বাধীন জীবনের দিকে আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে গেল ও।

ওর স্বামী বিষয়ে কোনও কৌতূহল অখিলেশ কখনওই প্রকাশ করতেন না। ও, নিজে থেকে যেটুকু বলার বলত। অখিলেশ চুপ করে শুনতেন। কিছু বলতে অখিলেশের সংকোচ হত। স্ত্রী অন্য একজনের প্রেমে পড়েছে, এই প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়ার পর, এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই সম্পর্কটি ভেঙে দিতে প্রধান উদ্যোগ নিয়ে সফল হওয়ার পর, নিজের স্ত্রী বিষয়ে একটি ধারালো কাঁটা কারও মনে গেঁথে থাকতে পারে। কাঁটার আকার দিনে দিনে বড় হয়ে উঠে সেই দাম্পত্যকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে— এই অনুমান অখিলেশের মনে জায়গা নেয়। উলটোদিকে ও যদি স্যারের অবস্থান তখনও কত প্রবলভাবে আছে, ছোট্ট একটি ঘটনায় অখিলেশ একদিন সেকথা বুঝতেও পারেন।

অখিলেশের সিডি প্লেয়ারে 'প্রভু আমার প্রিয় আমার পরমধন হে' এই গানটি বেজে উঠল। আগে অন্য অন্য গান বেজেছে। একটি সিডিতে বারোটি গান। সিডি প্লেয়ার চলছে। ও আর অখিলেশ নীরব শ্রোতা।

'প্রভু আমার প্রিয় আমার' গানটি আরম্ভ হতেই, ও অখিলেশের দিকে ঘুরে তাকাল। বিহ্বল দৃষ্টি। বলল কাঁপা গলায়, "একটা কথা বলব?"

অখিলেশ ওর এই চকিত ভাবান্তর বুঝতে পারেন না। এখনও এতদিনেও অখিলেশ ওর অনেক কিছুই ঠিক বুঝতে পারেন না। বলেন, "বলুন, বলুন। এত দ্বিধা করছেন কেন?"

ও বলে, "এই গানটা প্লিজ বন্ধ করে দিন। প্লিজ।"

অখিলেশ উঠে পড়েন সোফা থেকে। এক্ষুনি বন্ধ করে দিচ্ছি। রিমোট হাতে নিয়ে সিডি প্লেয়ার অফ করে দেন অখিলেশ। ফিরে এসে সোফায় বসার পরেই ও বলল, "রাগ করলেন?"

অখিলেশ বলেন, "না, রাগ করিনি তো। অবাক হয়েছি মাত্র।"

ওর মুখে আবার সেই ম্লানতার গাঢ় ছায়া ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ।

ও-ই কথা শুরু করে, "কী জানেন, স্যার এই গানটা খুব পছন্দ করতেন। স্যারের মোবাইল থেকে আমি আমার মোবাইলে এই গানটা নিয়েছিলাম।"

অখিলেশ বলেন, "ঠিক আছে, অত বলতে হবে না। এসব বলতে গিয়ে তো কষ্ট হয় আপনার। থাক। ওই গান তো আমরা এখন শুনছি না। নিজের ওপর স্ট্রেন করবেন না।"

ও কেমন আকুল হয়ে বলে, "না-আ। আমাকে একটু বলতে দিন। আপনার কাছে বলতে পারলে একটু হালকা হতে পারি।"

অখিলেশ বলেন, "আচ্ছা, বলুন তবে।"

ও ধীরে ধীরে বলে, যেন পিছনদিকে ফিরে যাচ্ছে ওর মন। এইরকমভাবে ও বলতে থাকে, "স্যার এই গানটা পছন্দ করতেন বললে সবটা বলা হয় না। স্যারের সঙ্গে যখন রিলেশন হল, আর আমি জানতে পারলাম এই গান হল স্যারের সবচেয়ে প্রিয় গান। তারপর থেকে স্যারই আমার কাছে 'প্রভু আমার প্রিয় আমার' হয়ে উঠলেন। স্যারকে ভেবে ভেবেই কতদিন একা একা এই গান গেয়েছি। এখন আর একটুও সহ্য করতে পারি না। এই গান শুনলেই সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।"

অখিলেশ একটু হেসে বললেন, "তা হলে আপনারও আমাদের মতোই একই ব্যাপার হয়, বলুন তাই না?"

ও ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, "আপনাদের মতো একই ব্যাপার? মানে?"

অখিলেশ ধৈর্য ধরে বলেন, "আগে একদিন বললেন যে, আপনার জীবনে কী ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনও বিশেষ গান জড়িয়ে আছে কি না আপনি সেকথা ভাবেন না। বরং ভাবেন সেই গানটির কথা ও সুরের মধ্যে যোগাযোগ ঘটছে কীভাবে— বললেন তো একদিন? বড় অপরূপ করে বুঝিয়ে দিলেন সেদিন। সুর আর কথার সংযোগ আমি এভাবে কখনও ভেবে দেখিনি। অবশ্য ভাববই বা কী করে? আপনার তো গানের শিক্ষা আছে।"

ও অখিলেশের শেষের দিকের কথাগুলো শুনলই না।

ও বলল, "আমারও তো ওরকম হয় কখনও কখনও। ওরকম মানে নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনও কোনও ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে। কিন্তু 'প্রভু আমার প্রিয় আমার' এই গানটা সহ্য করতে পারি না। শুনলেই স্যারের সঙ্গে কাটানো দিনগুলো মনে পড়ে যায়। একেবারে নিতেই পারি না এই গানটাকে।"

আজ অখিলেশ ভাবেন, ওর কি এখন আমার সঙ্গে যাপন করা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে? অখিলেশ নিশ্চিত, সেসব কথা মনে পড়ে না। একবারও মনে পড়ে না। স্যার ওকে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ও নিজে বলেছে অখিলেশকে। তা ছাড়া, ওর সেই সম্পর্ক ভেঙে যায় স্বামীর প্রবল চাপে। ওর নিজের ইচ্ছেয় নয়। কিন্তু অখিলেশের ক্ষেত্রে ও তো নিজেই সব ভেঙে দিয়ে চলে গিয়েছে। আজ দু'শো একানব্বই দিন হল। ওর একেবারেই মনে পড়বে না অখিলেশের কথা। এটা ওকে কেউ ভাঙতে বাধ্য করেনি। ও অখিলেশকে ছেড়ে চলে গিয়েছে স্বেচ্ছায়।

দশ

ও একদিন ওর স্বামীকে নিয়ে ওই উকিলের সঙ্গে দেখা করল। ওর স্বামী এল আলাদা, কলকাতার এক প্রান্ত থেকে। ও এল শহরের অন্য প্রান্ত থেকে। মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সের কাগজপত্র সই করল দু'জনেই, উকিলের নির্দেশ অনুযায়ী। উকিলের কাছেই সব জমা রইল। এখন একবছর মতো সময় লাগবে, দু'জনকে আলাদা থাকতে হবে। ও অবশ্য বেশ কয়েকমাস আলাদাই রয়েছে ওর নিজস্ব ফ্ল্যাটে। মাঝে মাঝে গিয়ে দু'-তিন দিন বাবা-মা'র কাছে থেকে আসে। বাবা-মা থাকেন কোন্নগর। অখিলেশ একবার ওদের কোন্নগরের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনতলা বড় বাড়ি। আগেকার আমলের মজবুত কড়ি-বরগা বসানো সিলিং। ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে সেই বাড়িতে থাকে একজন পুরনো পরিচারিকা। বাবা-মায়ের মনে এক চাপা দুশ্চিন্তা দেখে এসেছিলেন অখিলেশ, মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে। সেই দুশ্চিন্তা তাঁরা খুলে বলেননি বটে, তবে অর্ধস্ফুট হয়েছিল মাত্র ওঁদের ভাবনা। দু'-চারটি ছোট ছোট অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে সেই দুশ্চিন্তার আন্দাজ দেখেছিলেন অখিলেশ। ও কিন্তু স্পষ্ট করেই অখিলেশকে বলেছে কয়েকবার যে, বাবা-মা এই ডিভোর্সটা চাইছেন না। এই বিয়েটা যে, ওর ভাষায় যাকে 'ওয়র্ক করেনি', এটাকেও ও নিজের একটা ব্যর্থতা বলেই মনে করে। ওদিকে স্বামীর প্রতিও নানা কারণে ওর কোনও দোষ পস্টি। ও বিয়ের এতদিন পরে খুব সুস্পষ্টভাবেই বুঝেছে যে, ও আর ওর স্বামী দু'জন পুরোপুরি আলাদা ধরনের মানুষ। একসঙ্গে থাকা যায় না।

অখিলেশ এসব কথার সময়, প্রায়-নীরব থেকে ওকে সমর্থন করে চলেন। কখনও কখনও 'তাই তো', 'সে তো বটেই' এই ধরনের ছোট ছোট দু'-একটা বাক্য উচ্চারণ করেন। আসলে অখিলেশ ভাল করে বুঝতেও পারেন না, ওকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ, অর্থাৎ কোনও প্রশ্ন তোলার কথা চিন্তা করাও ততদিনে অসম্ভব হয়ে গেছে অখিলেশের পক্ষে।

ইতিমধ্যে অখিলেশ হঠাৎ একদিন নিজের ফোনে ওর পাঠানো একটি মেসেজ ভেসে উঠতে দেখলেন। খুব সংক্ষিপ্ত মেসেজ। ইংরেজি ভাষায় লেখা। কথাটা হল Love u!

মেসেজটা দেখার সময় অখিলেশ একটি মিটিংয়ে ছিলেন। অখিলেশের সামনে থেকে কয়েক মিনিটের জন্য মিটিংয়ের অন্য সব সদস্যরা ঘর থেকে লুপ্ত হয়ে গেলেন। পুরো ঘরটাই লুপ্ত হয়ে গেল। অখিলেশ যেন একটি নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে, যে-প্রান্তরের কিনারে একটি মাত্র গাছ। গাছের চারদিকে গোল ছায়া পড়ে আছে। অখিলেশ দাঁড়িয়ে ঘর রৌদ্রের ভিতর। এইসময় ওই ছায়া থেকে বেরিয়ে এল একটি নারী। সাদা সালোয়ার কামিজ, নীল পাড় দেওয়া সাদা ওড়না, চোখে চশমা। সেই নারী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে উদ্ভাসিত রোদ্দুরের ভেতর দিয়ে। রৌদ্রস্নাতা সেই নারীর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন অখিলেশ। ওর মুখ। ও এগিয়ে আসছে অখিলেশের দিকে।

"আমাদের পরের অ্যাজেন্ডা হচ্ছে গ্রন্থপ্রকাশ। কী কী বই এবার বৃক্ষফোয়াদে আমরা প্রকাশ করার চেষ্টা করতে পারি সেটা এখন একবার দেখে নেওয়া যাক।"

অ্যাকাডেমির সচিবের গলা অখিলেশের কানে পৌঁছতেই ঘোর ভেঙে গেল অখিলেশের। অখিলেশ মিটিং-এর মধ্যে ফেরত এলেন। আসন্ন বইমেলার জন্য কোন কোন বই যত্নস্থ হয়েছে, কোন কোন বই হয়নি, কিন্তু তাদের যত্নস্থ করা দরকার— সে বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হল। অখিলেশ অর্ধমনস্কভাবে আলোচনার সঙ্গে যুক্ত রইলেন। একসময় মিটিং শেষ হল।

অখিলেশ মিটিং থেকে বেরিয়ে একটি ফোন পেলেন। আধঘণ্টার মধ্যে। ওর ফোন।

ফোন বলছে, "আমার মেসেজ পেয়েছিলেন?"

অখিলেশ বলেন, "পেয়েছিলাম।"

ও প্রান্তের কণ্ঠস্বর বলে, "উত্তর দিলেন না যে! রাগ করেছেন মেসেজটা পাঠিয়েছি বলে?"

অখিলেশ বলেন, "রাগ? না তো। রাগ করব কেন?"

ও প্রান্তের স্বর এবার উৎকণ্ঠিত, "নিশ্চয়ই রাগ করেছেন এরকম মেসেজ পেয়ে।"

অখিলেশ কী করে বোঝাবেন তাঁর মন কতখানি আলোয় ভরে উঠেছে ওই মেসেজে।

আবার প্রশ্ন, "উত্তর দিলেন না কেন?"

অখিলেশ বলেন, "আমি মিটিংয়ে ছিলাম। উত্তর নিশ্চয়ই দেব।"

ফোনে কথা হচ্ছে একটা করিডোরে দাঁড়িয়ে। করিডোরের একদিকে পরপর চারটে ঘর। প্রেসিডেন্টের ঘর, সচিবের ঘর, প্রকাশনা সম্পাদকের ঘর আর গেস্টরুম। গেস্টরুম কখনও কখনও কনফারেন্স রুমেও রূপান্তরিত হয়। তবে আজকের মিটিং হচ্ছিল প্রেসিডেন্টের ঘরে। চারটে ঘরেই ক্রমাগত লোকজন ঢুকছে এবং বেরোচ্ছে। করিডোরের বাঁদিকে একটি চত্বর। সেখানে যত্ন করে বড় করা তিনটে গাছ। গাছের তলায় বসবার জন্য সিমেন্ট-বাঁধানো বেদি। দু'টি গাছের মাঝখানে বেঞ্চ পাতা। গাছের তলায় আর বেঞ্চে দু'জন দু'জন করে তরুণ-তরুণী বসে রয়েছে। অখিলেশ ভাবতে লাগলেন, জীবন কত বড় এক বিস্ময়ের জিনিস। যৌবন পার হয়ে আসা অখিলেশের মনে কীভাবে জাগ্রত হয়ে উঠল এই প্রেমের জোয়ারস্রোত। মিটিং চলাকালীন এই গ্রুপ-ডি স্টাফ বারবার চা দিয়ে যায়, তাকে দেখেও ভাল লাগছে অখিলেশের। সকলকেই ভাল লাগছে। গাছের তলায় জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকা তরুণ-তরুণীদের দিকে তাকিয়ে অখিলেশ মনে মনে বললেন, "তোমরা জানো না, কেউ-ই জানে না জগতে যে, এই বয়সেও আমাকে একজন নারী ভালবাসে।" শুধু এই অনুভবটুকুই যেন সকালের রৌদ্রভরা সারি সারি ফুলগাছ। প্রভাতী বাতাসে ফুলগাছেরা গুচ্ছে দোলা লাগছে— অখিলেশের বুকের ভিতর।

অখিলেশ করিডোরে দাঁড়িয়ে কখনও সচিবের সঙ্গে, কখনও অন্য অন্য সদস্যদের সঙ্গে একটা-দুটো প্রয়োজনীয় কথা বলে নিচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট বেরলেন তাঁর ঘর থেকে। প্রেসিডেন্টকে সকলে একসঙ্গে

প্রেসিডেন্টের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছেন, সেই দলে অখিলেশও আছেন। কিন্তু সারাক্ষণ অখিলেশের মন বারুদ, "আমি একা নই, আমাকে একজন ভালবাসে। আমি এখন দেবতার মতো বেঁচে আছি নিজের একান্ত ভিতরে। আবার প্রেম আসবে জীবনে কখনও কল্পনা করিনি, সেই প্রেম নিজে থেকে এসে স্বীকৃতি জানাবে, ভাবিনি কখনও।"

আবার মেসেজ ফুটে উঠল, "Love u"— এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। অখিলেশের মন আলোয় আলোকময় হয়ে যাচ্ছে। গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো আনন্দের কণা অবিরল ঝরে পড়ছে, ভেসে বেড়াচ্ছে অখিলেশের চারদিক ঘিরে। করিডোরের শেষপ্রান্তে একটি বাথরুম। প্রেসিডেন্ট চলে যাওয়ার পর বাকি সদস্যরা এবার সচিবের ঘরে কিছুক্ষণের জন্য বসবেন। আরও একপ্রস্থ চা খাওয়া হবে। সচিব অখিলেশকেও ডাকলেন। 'আসছি' বলে অখিলেশ বাথরুমে ঢুকলেন। বাথরুমটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং আকারে বেশ বড়। বাথরুমে ঢুকে অখিলেশ দরজাটি ভিতর থেকে ভাল করে বন্ধ করলেন ছিটকিনি তুলে। তারপর মোবাইল বার করলেন। খুব সম্ভর্পণে একটি কথাই টাইপ করলেন। বাংলায়। কথাটি হল, "ভালবাসি।" এই একটিমাত্র কথা টাইপ করতে গিয়ে অখিলেশ দেখলেন তাঁর হাত কাঁপছে। অখিলেশ মেসেজ পাঠিয়ে দিলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন তারপরেই। মেসেজের কেবল এই একটি কথা টাইপ করার জন্য অখিলেশের একটি নির্জন আড়াল প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বাথরুম সেই নির্জনতা দিল।

এরপর অখিলেশ যখন সচিবের ঘরে ঢুকলেন, অখিলেশ অনুভব করলেন তাঁর গা থেকে যেন জ্যোতি বেরচ্ছে। এই জ্যোতির্বলয় বলা বাহুল্য আর কেউ-ই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু এই জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় অখিলেশ কথা বলছেন টুকটাক। চায়ের কাপ তুলছেন এবং নামিয়ে রাখছেন, একসময় উঠে পড়ছেন সচিবের ঘর থেকে, বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠছেন। বাড়িতে যখন ফিরলেন অখিলেশ, দেখলেন মেয়ে টুকুন তার ফোনে কী একটা নতুন হিন্দি ফিল্মের গান বাজাচ্ছে। এরকম গান শুনলে অন্যসময় কোলাহল মনে হয় অখিলেশের, কিন্তু আজ অখিলেশের ভাল লাগল ওই গান। অখিলেশ হাতে শুধু হরলিক্স্ আর বিস্কুট খান। মা আর মেয়ে যখন খেতে বসল, অখিলেশ নিজের হরলিক্স্ বানিয়ে বিস্কুটের কৌটো হাতে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অন্যান্য দিন অখিলেশ হরলিক্সের কাপ হাতে নিজের ঘরে চলে যান আর বৃদ্ধদেব বসু অথবা শঙ্খ ঘোষের কোনও প্রবন্ধের বই খুলে বসেন। আজ অখিলেশ সুরমার সঙ্গে অনেকক্ষণ খুঁটিনাটি গল্প করলেন। সুরমার বৃদ্ধা মা বেঁচে আছেন, সুরমার বোনের বাড়িতে থাকেন, সেই বৃদ্ধার খোঁজখবর নিলেন। আশ্চর্য হল অখিলেশের টুকুনের অফিস-সংক্রান্ত কথা বলতে আজ বিশেষভাবেই ভাল লাগছে অখিলেশের। টুকুনকে অখিলেশ জিজ্ঞাসা করলেন, টুকুনের অফিস কেমন চলছে। টুকুন সারাদিন বাড়ি থাকে। সকাল ন'টায় বেরিয়ে যায়, রাত আটটায় ফেরে ক্লান্ত হয়ে। টুকুন একটু অবাক হল অখিলেশকে টুকুনের অফিস-সংক্রান্ত কথা জিজ্ঞাসা করতে দেখে। অখিলেশ বুঝতে পারছিলেন, জীবনে নতুন করে ভালবাসা এলে চারপাশে সবকিছুকে নতুন মনে হয়। আনন্দের এমন এক জোয়ার বইতে থাকে মনের ভিতরে যে, প্রাত্যহিক ও নিত্যন্ত স্বাভাবিক জিনিসকেও যেন বিশেষ উজ্জ্বল এক রূপ নিয়ে দেখতে পাওয়া যায়। অখিলেশের একবারও মনে হল না সুরমার প্রতি তিনি কোনও অন্যায় করেছেন। বরং এই নতুন ভালবাসা অখিলেশের জীবনে পদার্পণ করার পর অখিলেশের মনে হতে লাগল সুরমাকে তিনি যেন নতুন করে ভালবাসতে পারছেন। অখিলেশ বুঝতে পারলেন এই বয়সেও তাঁর মন তাজা এবং তরুণ হয়ে উঠেছে।

ও এরপর যখন অখিলেশের বাড়ি এল, অখিলেশের মনে হল অখিলেশ যেন ভাল করে ওর দিকে তাকাতে পারছেন না। ও কিন্তু একই রকম স্বাভাবিক, একই রকম হাসিখুশি। দু'জনে যখন বাইরের ঘরে বসে অন্যান্য দিনের মতো গীতবিতান খুলে কথা বলছেন, তখন হঠাৎ অন্য একটা কথা বলে ফেললেন অখিলেশ। ও সেদিন 'বাজিল কাহার বীণা' গানটি নিয়ে কথা বলছিল। ও বলছিল, "দেখুন প্রথম অন্তরায় রয়েছে 'প্রভাতকমলসম ফুটিল হৃদয় মম'— কী জায়গায় সুরটি কীরকম করুন।" একথা বলার পরেই ও আপন মনে নিচু স্বরে গানের এই লাইন দু'টি একবার গেয়ে দেখাল। বলল, "'ফুটিল' এই জায়গায় সুরটি কীরকম দেখেছেন? তারসপ্তকের গান্ধারে গিয়ে খোঁচটা লাগিয়েই আবার সুর নেমে আসছে। এটা কীরকম আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না?"

অখিলেশ জানতে চান, "আশ্চর্য কেন?"

ও বলে, "কথাটায় বলা হচ্ছে ফুটে উঠল। প্রস্ফুটন বলা হচ্ছে। ফুটিল। ওদিকে সুরের ওই খোঁচটা তারসপ্তকের একেবারে গান্ধারে গিয়ে লাগছে তো, কীরকম একটা যেন পিন ফোটানোর মতো নয় কি? সুরের এই জায়গাটা? কথায় রয়েছে ফুটিল, অর্থাৎ ব্লুমিং— আর সুর বলছে যেন কোনও বিদ্ধতা। ওই খোঁচটা এমনভাবে আসছে যেন কিছু বিদ্ধ করা হল। কী অদ্ভুত না?"

অখিলেশ বলেন, "এভাবে তো কখনও ভাবিনি।"

ও বলল, "আমি যখন প্রথম এই গানটি বারবার শুনতে লাগলাম তখন সুরের এইরকম চলন দেখে আমার কেমন খটকা লেগেছিল। প্রত্যেকটা অন্তরাতেই সুর এইভাবে চলেছে, একটা খোঁচ, তারসপ্তকের গান্ধারে একটা খোঁচা দিয়েই সুরের নেমে আসা— এই জিনিস পুরো গানটা ধরেই চলেছে। আগের দিন এই গানটি আপনাকে পড়ে শোনাতে বলেছিলাম, মনে আছে?"

অখিলেশের মনে পড়ল, এর আগে যেদিন ও এসেছিল, "বাজিল কাহার বীণা" গানটি অন্তত তিনবার পড়ে শোনাতে হয়েছিল অখিলেশকে।

অখিলেশ বললেন, "হ্যাঁ মনে আছে। সেদিন আপনি বারবার এই গানটিই পড়তে বলেছিলেন আমাকে।"

ও একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বলল, "বারবার তখন কথাগুলো শুনলাম তো, তারপর বাড়ি গিয়ে সুরটা কেবলই গুনগুন করছিলাম। তখনই মনে হল কথায় বোঝানো হয়েছে 'ফুটিল' বা ব্লুমিং— অথচ সুরের চলনে এই বিদ্ধতা কেন? আপনি কি বলতে পারেন? কী মনে হয় আপনার?"

অখিলেশ বলেন, "আমার তো কখনও এরকম কিছু মনে হয়নি। আপনিই বলুন!"

ও গীতবিতানের পৃষ্ঠা উলটে নিয়ে অপর পাতায় চলে গেল। বলল, "দেখুন, গানের একদম শেষে বলা হচ্ছে 'আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,/ কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে!'"

ও এবার নিজের কোল থেকে গীতবিতান নামিয়ে রাখল সামনের ছোট্ট টেবিলটার ওপর। বলল চলল, "কার যেন বীণা বেজে তখন তীব্র একটা আনন্দ এসে লেগেছে মনে। তীব্র কথাটা বলছি কেন? তারসপ্তকের গান্ধারে ওই খোঁচটা মনে রেখেই বলছি। ওই খোঁচ যেন হঠাৎ লাগছে। খুব তীব্র আর গোপন কোনও আনন্দ হলে একরকম কষ্টও কি তার সঙ্গে মিশে থাকে না? বলুন, থাকে তো?"

এসব কী বলছে ও? অখিলেশ ভাবেন। একেবারে অখিলেশের মনের বর্তমান অবস্থাটাই তো ও বলে চলেছে রবীন্দ্রনাথের এই গানে সুরের চলনরোধ করেছিল।

অখিলেশ উত্তর দেন, "থাকেই তো!"

ও এবার যেন একটা কূল খুঁজে পায়। বলে, "গানটির শেষে আছে 'আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,/ কাঁপে নদী বনরাজি'— অত বড় একটা মানুষ, তার ওইরকম বিপুল ইমোশন, তার বাসনা কত তীব্র হতে পারে একবার ভাবুন! সেই ইমোশন আর সেই বাসনাকে কি ধারণ করবে? তিন ভুবনে সেই বাসনা বেজে উঠেছে তো। ওই বীণা বেজে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে বেজে উঠেছে তীব্র আর বিপুল বাসনারাজিও— তার ফলে নদী আর বনরাজি কাঁপছে— এবার গানের শেষ কথাটি লক্ষ করুন, একেবারে শেষ কথাটি কী?"

অখিলেশ বলেন, "বেদনাভরে।"

অখিলেশ যেন এতক্ষণে গানটিকে স্পর্শ করতে পারেন নতুনভাবে।

ও বলে, "বেদনাভরে কথাটা আসছে বাসনারাজি থেকে। বাসনারাজির সঙ্গে লিংক রাখছে এই বেদনাভরে। প্রেমের গান তো! যতই আনন্দ হোক, চাপা একটা বেদনা কিন্তু থাকছেই। ও একটু দম নেওয়ার জন্য থামল। উঠে গিয়ে খাওয়ার টেবিল থেকে জলের বোতল নিয়ে জল খেল। আবার এসে বসল অখিলেশের সামনে সোফায়। বলল, "এত আনন্দের মধ্যেও বেদনার ওই চাপ সারাক্ষণ থাকছে তো, সেইজন্যই অন্তরায় গেলেই তারসপ্তকের গান্ধারে গিয়ে ওই খোঁচাটা লাগছে। যেন বিঁধে যাচ্ছে বুকে। অর্থাৎ একরকম বেদনাকে সমস্তক্ষণ বহন করে চলতে হচ্ছে, বাসনা, খোঁচা থেকে যে-বেদনার উৎপত্তি— তাই, সুরের চলন, ওই খোঁচা দিতে দিতেই গানকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ওই বেদনাকে বহন করার ইঙ্গিত রাখছেন রবীন্দ্রনাথ সুরপ্রয়োগের মধ্যে। গানের মাঝখানে এক জায়গায় একথাও বলা আছে 'লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,/ কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।' দুঃখে শুধু নয় সুখেও ব্যথা লাগছে বুকে এবং সেকথা বুঝিয়ে বলা যাচ্ছে না, কারণ— 'না জানি কথা।' কথা দিয়ে যা বলা যাচ্ছে না, বোঝানো যাচ্ছে না, তা নিশ্চয়ই গোপন। সেই গোপন আনন্দের চাপে আর বাসনার উত্তাপে ওই ব্যথা। ওই বেদনাভরে। ভাবুন রবীন্দ্রনাথ বলছেন— না জানি কথা। তার মানে ব্যথা এতই বেশি। তাই সুর সেই বিশেষ ব্যথাকে বেদনাকে বলতে-বলতে চলেছে। হঠাৎ-হঠাৎ অন্তরায় একটা করে খোঁচ রেখে যাচ্ছেন। তারসপ্তকের গান্ধারে গিয়ে লাগছে সেই ব্যথা।"

ও এতক্ষণ পরে একটুখানি চুপ করা মাত্র অখিলেশ বলে ফেললেন সেই কথাটা, "আপনি যদি আমাকে কোনওদিন ছেড়ে যান, তা হলে আমার কী হবে?"

এতক্ষণ ওর মুখ পঞ্চপ্রদীপের সম্মিলিত শিখার মতো জ্বলছিল— যতক্ষণ ও গানটির সুর আর কথার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে চলেছিল। অখিলেশের আচমকা বলে ফেলা কথাটির সামনে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ওর মুখ ম্লান হয়ে গেল। ওর গলার স্বর নিচু হয়ে এল, "কী করে বললেন এই কথা? আমি কোথায় যাব? কার কাছে যাব?"

অখিলেশ তখন মরিয়া।"যদি আমাকে ছেড়ে যান, আমি তো নিতান্ত সাধারণ মানুষ— আপনি আমাকে ছেড়ে গেলে আমি সহ্য করতে পারব না সে আঘাত।"

ওর মুখের ম্লান ছায়া আরও স্পষ্টতর হয়। বলে, "কোথায় যাব? স্যার যখন আমাকে তাড়িয়ে দিলেন আপনি না থাকলে আমি কোথায় যেতাম? ভাগ্যিস আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।"

সেদিন দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল অখিলেশ। বললেন, "আশ্রয় তো আপনি আমাকে দিয়েছেন। এই বয়সে এমন সম্পদ পাব সে কথা কি স্বপ্নেও ভেবেছি?"

সুরমা ভেতরের ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, "আজকে চিংড়িমাছ হয়েছে বাড়িতে। আপনি আজ আমাদের এখানে রাতে খেয়ে যান।"

এইবার ও ঘড়ি দেখল। বলল, "এ কী, সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে তো! রাতে খেতে পারব না। অন্য একদিন দুপুরে এসে খাব।"

সুরমা উঠে এলেন বাইরে। ফ্রিজ খুললেন। বললেন, "ঠিক আছে চিংড়ি গরম করে দিচ্ছি। একটু টেস্ট করে যান অন্তত। ও উঠে পড়ল। কামিজটা টেনে ধরে নামাল। ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে বাথরুমের দিকে এগোতে-এগোতে বলল, "ঠিক আছে, টেস্ট করব। তবে একটু তাড়াতাড়ি। আমার ফ্ল্যাটে কাজের মেয়েটি এসে পড়বে। ওকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমি না পৌঁছলে।"

বলতে-বলতে বাথরুমে ঢুকে পড়ল ও। মাইক্রোআভেনে চিংড়ির তরকারি গরমে বসালেন সুরমা। তার গোঁ-ও-ও আওয়াজ শুনতে লাগলেন বাইরের ঘরে বসে অখিলেশ।

ভাবতে লাগলেন, এক্ষুনি ও চলে যাবে। আরও দু'দিন কি তিনদিন দেখা হবে না। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে এমন গভীর ভাবনা যে-মেয়ে ভাবতে পারে, সেই মেয়ে মেসেজে 'LOVE U'-ও লিখতে পারে? কী আশ্চর্য, তাই না?

এই মেয়েটিকে ভাল করে বুঝতে পারেন না অখিলেশ। শুধু এইটুকু বোঝেন যে, এই মেয়ে এখন অখিলেশের বুকের একটা পাঁজর। তার একটুও কম কিছু নয়।

এগারো

এখন অখিলেশের মন সারাক্ষণ ভরিয়ে রাখে গভীর এক আনন্দের উজ্জ্বলতা। অখিলেশ দেখেন ও জানতে পারেন অন্য-অন্য কবি সাহিত্যিকের মঞ্চে উঠে বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করছেন। কেউ-বা নিজের অথবা অনুজ কোনও সাহিত্যিকারের গ্রন্থ উন্মোচন করে ভাষণ দিচ্ছেন। কেউ-কেউ সমস্ত সাহিত্যপাঠের অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। অখিলেশের এইসব কাজকে খুব লঘু মনে হয়। অখিলেশ ভাবেন, তাঁর মনে যে গভীর আনন্দের স্রোত বইছে, সেই আনন্দ তো ভালবাসার আনন্দ। কোনও সভায় সভাপতি হলে, বা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে ভাষণ দিলে যে সেই আনন্দলাভ করা যায় না, সেকথা খুব ভাল করে বুঝতে পারেন অখিলেশ। কারণ সভাপতিত্ব তিনিও করেছেন, মঞ্চে উঠে কাব্যপাঠ অথবা স্মারক বক্তৃতা প্রদান, এইসবই তিনি কখনও না কখনও করেননি তা নয়। তবে এগুলি সবই হল বাইরের আড়ম্বর। এই যে অখিলেশ এখন ভাবতে পারছেন, এই শহরের কোথাও না কোথাও আছে একটা মেয়ে— বিশেষ একটা নম্বরে ফোন বাজালেই যার গলা শুনতে পাওয়া যাবে— এর তুল্য আনন্দবোধ কি সভাজনতার কোলাহল-মঞ্চে লাভ করা যায়? কখনওই যায় না।

অবশ্য ও যে শুধু কলকাতা শহরেই সর্বদা অবস্থান করে, তা নয়। বিভিন্ন সেমিনার অথবা কনফারেন্সে যোগ দিতে ওকে প্রায়ই শহরের বাইরে যেতে হয়। যেমন দিল্লি আর পুনে, চেন্নাই আর আমদাবাদও ঘুরে এল গত সাত-আটমাসের মধ্যে। প্রত্যেকবার এয়ারপোর্টে পৌঁছে একটা ফোন করে ও জানায়, "বোর্ডিং পাস নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সিকিউরিটি চেকিংও হয়ে গিয়েছে। ফ্লাইটে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছি।"

অখিলেশ জানতে চান, "উইন্ডো-সিট চেয়েছেন কি? ও হেসে উত্তর দেয়, উইন্ডো-সিট নিয়ে আমি কী করব? আমি তো ঘুমোতে ঘুমোতে যাব।" অখিলেশ বলেন, "ল্যান্ড করার পর একটা ফোন করে জানাবেন কিন্তু।" সত্যিই সেই ফোন আসে। তখন অখিলেশ বলেন,"কোথায় উঠবেন?" ও বলে, "ইউনিভার্সিটির গেস্ট হাউসে রাখবে শুনেছি। একটা আটো ধরে যাব। কখনও বলে প্রিপেড ট্যাক্সি নিয়ে নিচ্ছি, চিন্তা করবেন না।"

চিন্তা তবু অখিলেশের হতেই থাকে। ঘণ্টা দুয়েক বাদে অখিলেশের ফোন যায়, "কেমন ঘর পেলেন? লাঞ্চ-এ কী দিল?" ও যেমন-তেমন একটা জবাব দেয়, "লাঞ্চ তো কাল থেকে সেমিনারের সময় দেবে। গেস্ট হাউসের সঙ্গে একটা ক্যান্টিন আছে, আজকে ওখানে খেয়ে নিয়েছি।"

অখিলেশ আবার জিজ্ঞাসা করবেন, "কী খেলেন? খাবার ভাল ছিল?"

ও এবার হেসে ফেলবে, "সব আপনার জানতে হবে? দোসা খেয়েছি। দোসার দেশেই তো এসেছি।"

অখিলেশের মনে পড়ে যাবে, সত্যিই তো! এবার তো চেন্নাইয়ে ওর সেমিনার। পরদিন রাত আটটা বাজতেই ফোন করবেন অখিলেশ, "কেমন হল আজকের সেমিনার?"

ও বলবে, "আজকে তো আমার প্রেজেন্টেশন ছিল না। পরশু দিন আমার বলা। ব্যাঙ্গালোর থেকে একজন স্পিকার এসেছেন। ভাল বললেন বেশ।"

অখিলেশ জানতে চাইবেন, "রাতের খাওয়া হয়েছে?"

ও বলবে, "এবার যাব। রুমমেট স্নান করতে গিয়েছে।"

অখিলেশ ছাড়বেন না ফোন। বলবেন, "রুমমেট কেমন?"

উত্তর হবে, "ভালই তো। কেরালার মেয়ে।"

অন্যরকম উত্তরও আসতে পারে— "কী জানি বাবা! একটু নাক উঁচু মতো আছে। দিল্লি থেকে এসেছে। অনেক সিনিয়র। তাই ম্যানাম বলছি।"

অখিলেশের নিজের সংসারের এত খুঁটিনাটি খোঁজখবর অখিলেশ কোনওদিনই রাখেন না। সুরমার হাতে সংসারের সব ভার চোখ বন্ধ করে ছেড়ে দিয়েছেন অখিলেশ। সংসারের সব ভার, মানে বাজার, মুদি, লাইফ ইনশিয়ারেন্স, ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্ম এবং রান্নার দেখাশোনা— সমস্তটাই সুরমার এলাকা। সুরমা একদিনের জন্য কোথাও গেলে চোখে অন্ধকার দেখেন অখিলেশ। কাজের মহিলার হাতে অখিলেশ একেবারেই খেতে চান না। সুরমা ছাড়া অখিলেশ নিজের জীবনকে ভাবতেও পারেন না। ও সেটা খুব ভাল করে বোঝে। মাঝে-মাঝে কৌতুক করে বলে, "সুরমাদি বেড়াতে গেলে তো আপনি একেবারে অচল হয়ে পড়েন।"

অখিলেশ সেকথা স্বীকার করেও নেন। কিন্তু দুপুরে, বিকেলে বা সন্ধ্যায় যখন ওর সঙ্গে গীতবিতান খুলে বসেন, আর রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গান নিয়ে কথা বলতে-বলতে ওর আখিতারা জ্বলজ্বল করে, সমস্ত মুখে ছড়িয়ে যায় একটি অপার্থিব আলো— তখন অখিলেশ সারা পৃথিবীকে ভুলে যান। অখিলেশের মনে হয়, কত বড় সৌভাগ্যবান মানুষ অখিলেশ। যখন অন্যান্য সাহিত্যিকরা সান্ধ্যসভায় পুষ্পস্তবক আর উত্তরীয় নিচ্ছেন এবং মাইকের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন, তখন অখিলেশ এক তরুণীর মুখে রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তর্যামি বিষয়ক কথা শুনছেন। এবং অখিলেশ জানেন এই তরুণী অখিলেশকে ভালবাসে।

সত্যি সত্যিই ওর আর অখিলেশের মধ্যে যোগাযোগের একটা প্রধান মাধ্যম ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। দু'জনে একসঙ্গে বসে সিডি প্লেয়ারে গান শুনতেন। দু'জনে নিয়মিত গীতবিতান খুলে বসতেন। অখিলেশ ওর পছন্দমতো গান পড়ে শোনাতেন ওকে। গান থেকে কখনও-কখনও রবীন্দ্রনাথকে, কখনও চিঠিপত্রে চলে যেত ও।

'নষ্টনীড়' গল্পটির এটা-ওটা-সেটা প্রায়ই উঠে আসত ওর কথায়।

প্রেমের কোনও সংলাপ দু'জনের মধ্যে ঘটে ওঠে না, যদিও দু'জনই দুজনকে স্পষ্ট করে ভালবাসা জানাতে ভুল করেননি।

ও বাড়ি চলে যাওয়ার পরেই মনের ভিতরটা ফাঁকা লাগতে শুরু করে অখিলেশের। অস্থির-অস্থির লাগে। কিছুক্ষণ পরেই ফোন করেন অখিলেশ, "কতদূর পৌঁছলেন?"

ও হাসে, "এই তো সবে রওনা দিলাম আপনার বাড়ি থেকে। আমার ফ্ল্যাট কি এখানে? সে তো অনেক দূর।"

অখিলেশ বলেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে। ফ্ল্যাটে পৌঁছে একটা খবর দেবেন।"

খবর আসত মেসেজে, "পৌঁছে গিয়েছি।"

অখিলেশ আর সুরমার পরিচিত যে-উকিলের কাছে সুরমার সঙ্গে গিয়ে প্রথম যোগাযোগ করেছিল ও, যে-উকিল ভদ্রলোক ওর আর ওর স্বামীর মিউচ্যুয়াল ডিভোর্সের কাগজপত্র সই করিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন— ও মাঝে-মাঝে এখন সেই উকিলের চেম্বারে গিয়ে দেখা করছে, এমন কথা ওর মুখ থেকেই শুনতে পান অখিলেশ। উকিল প্রথম-প্রথম ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে কয়েকদিন দেরি করতেন। বলতেন, "নেক্সট উইকের শুক্রবারে ফোন করুন।" ও হয়তো এই সপ্তাহের সোমবারে ফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছে। ও খুবই ভেঙে পড়ত। বলত, "দেখুন না, এক্সপার্ট আমাকে সময় দিচ্ছেন না।" অখিলেশ সান্ত্বনা দিতেন, "দেবেন, সময় দেবেন উনি। কত জটিল মামলা ওঁকে সামলাতে হয়। রোজ কোর্টে গিয়ে সওয়াল করা কি সহজ কথা? আমাকে একদিন সভায় ভাষণ দিতে বললে আমার নার্ভাস লাগে। সেখানে বিচারকদের সামনে, প্রতিপক্ষ উকিলের সঙ্গে সওয়াল করা... উনি নিশ্চয়ই সময় পাচ্ছেন না।

ওর কাতর কণ্ঠ বলত, "ঠিক বলছেন তো আপনি? উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন তো? আমাকে?"

শান্ত করতেন অখিলেশ। বলতেন, "নিশ্চয়ই দেবেন। উনি যখন আপনাদের কেসটা হাতে নিয়েছেন, নিশ্চয়ই গুরুত্ব দিয়েই সবটা দেখছেন।"

পরপর কয়েকদিন হল, ও আসছে, কিন্তু গীতবিতান খুলে আর বসা হচ্ছে না দু'জনের। ও এসেই কেমন যেন ছটফট করে, আর বলে, "এক্সপার্ট আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে দেরি করছেন।" অখিলেশের উত্তর শুনে একদিন বলল, "কে বলেছে আমি শুধু ওই কেসটা নিয়েই কথা বলতে চাই। ওই কেস তো যা হওয়ার হবেই। আমি তো কতদিন আগেই ওদের বাড়ি থেকে চলে এসেছি। নিজের ফ্ল্যাটে থাকি। ওই কেস ছাড়াও কি আমার নিজের বলার মতো কোনও কথা থাকতে পারে না?"

অখিলেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই থাকতে পারে। আপনি দু'দিন পরে আসব-একবার ফোন করব নাকি উনি কী বলেন।"

ওর মুখটা খুব আশাহত দেখাচ্ছে। বলল, "আপনি বলছেন যখন, দেখব আর-একবার ফোন করে। কিন্তু উনি তো পরের উইকে শুক্রবার ফোন করতে বলেছেন। আমি তার আগে ফোন করলে হঠাৎ রেগে যাবেন না তো?"

অখিলেশ আবারও সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "না না। আপনি ক্লায়েন্ট। আপনি ফোন করলে উনি রাগ করবেন কেন? আমি আর সুরমা তো অনেকদিন ধরেই টানি ওঁকে। না, রাগ করবেন বলে তো মনে হয় না। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে উনি ভদ্র ব্যবহার করেন।"

ও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে তখন। ওর মুখে সেই প্রথম দিকের হতাশার ছাপ যেন। ও বলছে, "ক্লায়েন্ট বললেন, তাই না? আমি তো শুধু ওঁর ক্লায়েন্ট! ঠিকই বলেছেন। বেশ, দু'দিন পরে ফোন করব। দেখি কী হয়।"

সেদিন সোমবার ছিল, দুটো দিন বাদ দিলে হয় বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার বিকেলে ও চুকল অখিলেশের বাড়ি। সোফায় বসে প্রথম কথাই বলল, "এবারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন না এক্সপার্ট," বললেন "এই সপ্তাহটা খুব ব্যস্ত। নেক্সট উইকে ফোন করে যেন আমি খবর নিই, তখন উনি বলতে পারবেন।"

আবারও সান্ত্বনা দেওয়ার পালা অখিলেশের, "সত্যিই তো! ল-ইয়ারদের ব্যস্ততা ঠিক কতখানি আমরা তো আর সেটা বাইরে থেকে বুঝতে পারব না। কিন্তু উনি যখন বলেছেন তখন সময় দেবেন নিশ্চয়ই।"

ও সেদিন আর বেশিক্ষণ বসল না। গীতবিতানটি নিজেই গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন অখিলেশ, অন্যান্য দিন ও-ই গিয়ে খুঁজে আনে। অখিলেশ আজকে একবার 'শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা' গানটি নিয়ে কথাও তুললেন। ওর দিক থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না তেমন। হঠাৎই বলল,"আজকে উঠি।"

অখিলেশ অবাক! বললেন, "আজকে এত তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছেন?" কাঁধে ব্যাগ তুলতে তুলতে বলল ও, "যাই। সকাল এগারোটায় ক্লাস আছে। একটুও পড়াশোনা হয়নি। বাড়ি গিয়ে বইপত্র নিয়ে বসতে হবে।"

তখন ক'টা বাজে? বড় জোর সন্ধে ছ'টা। গ্রীষ্মকাল। বাইরে তখনও মরে আসা বিকেলের আলো। ও চলে গেল। এত তাড়াতাড়ি তো যায় না কোনওদিন।

রাত সাড়ে আটটা। অখিলেশ থাকতে না-পেরে ফোন করলেন। ফোন বাজে, বাজে। বেজে বেজে উঠল অখিলেশের ফোন। অখিলেশ কিছু বুঝতে পারলেন না।

মিনিট পনেরো পরে বেজে উঠল অখিলেশের ফোন। অখিলেশ দেখলেন ও। বলল, "হ্যাঁ, বলুন। ফোন করেছিলেন আমাকে?"

ওর গলাটা ধরা-ধরা, স্বর একটু জড়ানো।

অখিলেশ বললেন, "এমনিই ফোন করেছিলাম। তারপর সকাল এগারোটার ক্লাসের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া হল?"

ফোনের মধ্যে শোনা গেল হাই চাপার আওয়াজ। বলল,"নাহ্! কই আর।" গলার স্বরে ক্লান্তি। বলে চলল, "বাড়ি এসে চেয়ার্ড লাগল। ফোন সাইলেন্ট করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতে থাকে যে কাজের

মেয়েটি, সে এসে অনেকবার বেল দিতে ঘুম ভাঙল। সত্যি কতবার যে বেল দিয়েছে। ওকে দরজা খুলে ফোনের টাইম দেখতে দিয়ে দেখি আপনার দুটো মিসড কল। বলুন, কী বলছিলেন?

অখিলেশ আবার অপ্রস্তুত। ঠিক কিছু বলবেন বলে তো ফোন করেননি অখিলেশ। এই সময়টা ও কোনওদিনই ঘুমোয় না। এই সময়টা অখিলেশের বাড়িতেই কাটিয়ে যায়। কখনও আসতে না পারলে অখিলেশকে ফোন করে কথা বলে ঠিক এই সময়টাই।

আজ হয়তো ক্লান্ত লেগেছে তাই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অখিলেশ বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। রেস্ট নিন তা হলে। আমি রাখছি। ফোন রেখে দিলেন অখিলেশ।

দশ মিনিট পর আবার ফোন বেজে উঠল। ফোনের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠলেন অখিলেশ। আবারও ও প্রথম দিকে এরকম ঘন ঘন ফোন করত। তখন অখিলেশ বুঝতে পারতেন না কেন ফোন করছে। এখন অখিলেশ জানেন কেন ফোন বাজল। তাই তিনি খুশি। প্রথম দিকে বারবার ফোন করতে শুরু করল যখন, তখন একদিন অখিলেশ বলেছিলেন, "এই তো দশমিনিট আগেই ফোন করলেন। এক্ষুনি আবার ফোন?"

উত্তর এসেছিল, "কেন, আপনার গলাটা একটু শুনতে ইচ্ছে করে যদি কারও তবে সে কী করবে? আপনাকে ফোন করা ছাড়া আর কী করতে পারে সে?"

আরও একদিন বলেছিল, "আমি তো এমনি-এমনিই ফোন করি, শুধু আপনার গলাটা একবার শুনব বলে।"

সেসব দিনে অবশ্য এখনকার মতো ওর ফোন পাওয়ার জন্য উদগ্রীব অপেক্ষায় থাকতেন না অখিলেশ।

এই মুহূর্তে অখিলেশের শরীরে মনে ছড়িয়ে পড়ল খুশির ঢেউ। বিকেলে বেশিক্ষণ বসেনি। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে ফোনও করেনি। এখন এই ফোনটা এসেছে ও নিশ্চিতই অখিলেশের গলা শুনতে চাইছে বলে। অলৌকিক সেই আনন্দ আবার। ও। ওর ফোন। ও অখিলেশের গলা শুনতে চায়।

ফোন হাতে ধরে অখিলেশ বারান্দায় এলেন। ঘরের ভিতর সবসময় ঠিকমতো টাওয়ার পাওয়া যায় না। বললেন, "কী? বলুন।"

ও দিক থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে এল। "আপনি ঠিক বলছেন তো? এক্সপার্ট আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন তো নেক্সট উইকে?"

অখিলেশ বললেন, "নিশ্চয়ই দেবেন। আমি আর সুরমা দীর্ঘদিন ধরে জানি উনি খুব সিনসিয়ার ওঁর কাজের ক্ষেত্রে," বলে ফোন রেখে দিলেন অখিলেশ। এও বুঝতে পারলেন, ওর অত উদ্বেগভরা কণ্ঠস্বরের বিপরীতে কত প্রাণহীন কত নিস্তাপ শোনাল অখিলেশের গলা। মনের ভেতরে জেগে ওঠা সেই অলৌকিক আনন্দের শিখাও একমুহূর্তে নির্বাপিত।

অখিলেশ সুরমার ঘরের সামনে গিয়ে বললেন, "আজকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। আমরা হরলিক্স্‌টা একটু বানিয়ে দেবে?"

সুরমা বললেন, "দিচ্ছি।" বলে সুরমা গেলেন রান্নাঘরের দিকে আর অখিলেশ পোশাক পরিবর্তন করতে শুরু করলেন। শুয়ে পড়বেন এবার।

সুরমা এককাপ হরলিক্স্‌ আর দু'খানা বিস্কুট প্লেটে করে নিয়ে পৌঁছে দিলেন অখিলেশের সামনে। অখিলেশের কাপ ডিশ রাখলেন পাশের টেবিলে।

এই টেবিলেরই এপাশে-ওপাশে দু'জন বসেন। দু'জন মানে ও আর অখিলেশ। টেবিলে থাকে গীতবিতান। কখনও-বা এই সোফায় পাশাপাশিও বসেন দু'জনে। দু'জন মানে সুরমা আর অখিলেশ নয়। অখিলেশ আর ও। হরলিক্সের কাপ হাতে তুলে বিস্কুটে কামড় দিয়ে অখিলেশ বললেন, "আমার প্রেশারের ওষুধটা দিয়ে যেয়ো।"

সুরমা বললেন, "আচ্ছা"।

সুরমা নিজের ঘরে চলে গেলেন। সেখানে একটি সিরিয়াল চলছে। মাঝপথে উঠতে হয়েছে সুরমাকে, তা নিয়ে কোনও অভিযোগ অবশ্য নেই— কিন্তু সিরিয়ালের কাছে ফেরত যাবার তাড়াহুড়ো আছে।

পরদিন শুক্রবার। রাত সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। দশটা চল্লিশ হল প্রায়। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল অখিলেশের। টেবিলে গিয়ে ফোন হাতে তুলে অখিলেশ দেখেন— ও। আজকে সারাদিনে দু'-তিনবার কথা হয়েছে। এমনি কথা, আদরকারি কথা। ফোন তিনবারই অখিলেশ করেছেন। দুপুরে, বিকেলে আর সন্ধেবেলায়। অখিলেশ ভাবলেন, কী এমন হল যে এত রাত্রে আবার ফোন করছে।

ফোন ধরে উদ্বিগ্নস্বরে অখিলেশ বলেন, "হ্যাঁ, বলুন।"

উলটোদিকের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত। বলছে, "এক্সপার্ট ফোন করেছিলেন। নিজে থেকে।"

অখিলেশ শান্তভাবে বলেন, "তাই বুঝি? কী বললেন?"

ও বলে যাচ্ছে কম্পিত গলায়, "আমি তো অবাক। আমার ফোনে ওঁর নাম ভেসে উঠতে দেখে! ভাবতেই পারছি না। কখনওই তো উনি ফোন করেননি আমাকে। এই প্রথম। কী আশ্চর্য, বলুন, তাই না?"

অখিলেশ বলেন, "তা তো বটেই। কিন্তু কেন ফোন করেছিলেন? অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন?"

ও বলে, "মঙ্গলবার, আগামী মঙ্গলবার। বিকেল পাঁচটা।"

অখিলেশ বলেন, "বলছিলাম না উনি খুব সিনসিয়ার। ওঁর ঠিক মনে থাকবে আপনার কথা।"

ও বলে চলেছে, "আমার কথা মনে আছে বলছেন? মনে আছে? ওঁর? আমার কথা?"

অখিলেশ বলেন, "আছেই তো। নইলে নিজে থেকে ফোন করেন? ওঁর তো কত ক্লায়েন্ট। তার মধ্যে থেকে মনে করে আপনাকে ফোন করলেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন। উনি খুব বড় মাপের মানুষ। কি, এবার খুশি তো?"

ও অসম্ভব অধৈর্যস্বরে বলে, "সেই কোন মঙ্গলবার। এখনও তিন-তিনটে দিন দেরি। কেন উনি কালকেই আসতে বললেন না আমাকে?"

অখিলেশ বোঝান, "শনিবার তো ওঁর চেম্বার বন্ধ থাকে। কোর্ট বন্ধ। ওঁর চেম্বারও বন্ধ।"

ওর গলার ধৈর্যহারা উত্তেজনা তবুও যায় না। বলে, "কিন্তু সোমবার তো দিতে পারতেন! তা হলে দু'দিন পরেই যেতে পারতাম। এখন তিনদিন হয়ে গেল। আচ্ছা রাখছি।"

সুরমা অখিলেশের সামনে দিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘর যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, "কী হল? তোমার মুখটা ওরকম হয়ে গেল কেন? কিসের ফোন এসেছিল?"

অখিলেশ আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন। বলেন, "না কোনও দরকারি ফোন নয়। বই কিছু হয়নি তো!"

সুরমা বলেন, "ফোনের কথা যখন শুনছিলে মুখটা তোমার ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল। কারও সঙ্গে ঝগড়াটিগড়া করোনি তো।"

অখিলেশ ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন, বলেন, "দূর, এ বয়সে আবার ঝগড়া কার সঙ্গে করতে যাব!"

সুরমা চলে যেতে যেতে বলেন, "কী জানি বাবা! কেউ কোনও সভায় যেতে বললেই তো তুমি গুম মেরে যাও, রাগ করো। সবাই যখন সভাসমিতিতে যাচ্ছে তোমারও যাওয়া উচিত বাপু..."

বারো

সেই মঙ্গলবার থেকে ওর সাপ্তাহিক রুটিন বেশ খানিকটা বদলে গেল। ও প্রত্যেক মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার এক্সপার্টের চেম্বারে যেতে শুরু করল। সপ্তাহে হয়তো একটা দিন অখিলেশের বাড়ি আসার সময় করতে পারে এখন। যখন আসে, তখন অখিলেশ লক্ষ করেন ওর মুখ খুবই আলো-আলো হয়ে আছে। অখিলেশ ভাবেন, অখিলেশের সান্নিধ্যে এসেছে বলেই ওর মুখে ওই আলো ফুটেছে। যদিও অখিলেশ ভেবে পান না, একজন ল-ইয়ারের কাছে একটি মিউচ্যুল ডিভোর্সের বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে যেতে হচ্ছে কেন? মামলা কি খুব জটিল

হয়ে পড়েছে? কিন্তু সংকোচবশে অখিলেশ কিছুই জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারেন না। তা ছাড়া প্রধান ব্যাপার হল, ও অখিলেশের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে, এটাই এত বড় একটা আনন্দের বিষয় অখিলেশের কাছে যে, অখিলেশের মন অন্য কোনও ভাবনা ভাবতেই সক্ষম হয় না। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই অখিলেশ সম্মোহিত হয়ে পড়েন। এই নারী আমাকে ভালবাসে, একাধিকবার মেসেজে সেই কথা লিখে জানিয়েছে। ছোট্ট মেসেজ, কিন্তু তা অতীব মূল্যবান অখিলেশের কাছে। ওর সামনে বসে, ওর আলো-আলো মুখের দিকে তাকিয়ে, অখিলেশ বেশ কয়েকমাস আগে পাঠানো সেই মেসেজ দু'টির কথা ভেবে যেতে থাকেন। তখন ও কী বলে? কোনওদিন বলে, "গত পরশু সন্ধ্যায় এক্সপার্ট আমাকে ওঁর চেম্বারের ঠিক পাশের খাবার দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এত ভিড়, বসবার জায়গা ছিল না। উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেলেন। পাশে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম! আমাকে একটা কোল্ড ড্রিংক কিনে দিলেন।"

অখিলেশ কেবলই ভাবেন, ওকে দেখলেই ভাবেন— এই সেই মেয়ে, যে আমাকে ভালবাসে। আর ও তখন বলে, "জানেন তো, এক্সপার্ট কিছুতেই আমার কাছে ফি নেবেন না। আমি ব্যাগ খুলতেই রেগে উঠলেন, তোমাকে কে বলেছে ফি দিতে হবে আমাকে? প্রথম দিন যা দিয়েছ, সে ঠিক আছে। তাই বলে রোজ আমার সামনে ব্যাগ খুলবে না।' বাবা, কী রাগ! আমি তো কোনওকরমে পালিয়ে এলাম।"

অখিলেশ বলেন, "হ্যাঁ, ওঁকে তো চিনি। উনি খুব উদার-হৃদয় মানুষ।"

ও হঠাৎ ফিক করে হাসল। বলল, "আবার পরের মঙ্গলবার ডেট দিয়েছেন। বললাম, 'তা হলে মঙ্গলবার আসব তো?' উনি বললেন, 'সেটা আবার বলবার কী আছে? তুমি তো মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার আসোই! চলে এসো মঙ্গলবারে!'"

অখিলেশ কথা খুঁজে পান না। এখন সপ্তাহে একদিন করে ও আসে অখিলেশের বাড়ি। কোনও কোনও সপ্তাহে ওই একটা দিনের সময়ও করে উঠতে পারে না। সেসব সপ্তাহে ওর আসাই হয় না। কিন্তু যখনই আসে, মুখটা যেন খুব আলো-আলো। একদিন এল হঠাৎ, ফোন না করে। দুপুরে। খোলা দরজার মুখে ও এসে দাঁড়াতেই অখিলেশ প্রথমে চমকে গেলেন। পরক্ষণে উদ্ভাসিত এক আনন্দের ঢেউ অখিলেশকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলল। অখিলেশের মনে হল, দরজায় দাঁড়ানো ওর শরীর থেকে যেন আলো ঝরছে। ও যেন আলোর একটি ঝরনা। সেদিন বসেই বলল, "এর মধ্যে একদিন এক্সপার্টের কাছে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। কলেজ থেকে বেরিয়েই সামনে উবর পেয়ে গেলাম। ভাল চালাল। ওঁর চেম্বারের দরজা খুলতে যে-লোকটি আসে, সে তখনও আসেনি। আমি দাঁড়িয়ে আছি ফুটপাতে, ওঁর চেম্বারের তালাবদ্ধ দরজায় বিকেলের রোদ্দুর পড়েছে— ওই তালাবদ্ধ দরজাটা দেখেই আমার যে কী আনন্দ হচ্ছিল কী বলব!"

এর উত্তরে আবারও কথা খুঁজে পেলেন না অখিলেশ। শুধু কোনওমতে বললেন, "তাই বুঝি!"

সেদিনও বেশিক্ষণ ও বসল না। গীতবিতান নামিয়ে আনলেন অখিলেশ। খুলে দেখল না। আধঘণ্টার আগেই বলল, "আজ উঠে পড়ি!"

অখিলেশ ওকে আরও একটু বসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করার মতো জোর পেলেন না যেন। ও উঠে গেল, অখিলেশ বসে রইলেন। বাইরে বিকেল নামতে শুরু করল। গাছে গাছে পাখি ফিরছে তার আওয়াজ। অখিলেশ উঠে দরজাটাও বন্ধ করলেন না। তাঁর চোখের সামনে তখনও ওর হঠাৎ এসে দরজায় দাঁড়ানোর ছবিটি ভাসছে।

মঙ্গল আর বৃহস্পতিবার যে ও আসবে না, সেকথা এখন জেনে গিয়েছেন অখিলেশ। আগের দিন একটা বৃহস্পতিবার ছিল, ফোনে কথা হয়েছে, অখিলেশ জেনেছেন যে, এক্সপার্টের চেম্বারে গিয়েছিল ও। পরের দিন শুক্রবার। বিকেল চারটে নাগাদ আশায় ভর করে মেসেজ পাঠালেন অখিলেশ, "আজ কি একবার আসবেন? আমি বাড়ি আছি।"

খবর আসত মেসেজে, "পৌঁছে গিয়েছি।"

উত্তর এল, মেসেজেই, "এক্সপার্টের চেম্বারে যাচ্ছি। এখন উব্‌রে।"

অখিলেশ মেসেজ করলেন, "বাহ্! ঘুরে আসুন।"

সঙ্গে সঙ্গে ফোন, "আপনি বাহ্ লিখলেন কেন? আমার ওপর রাগ করেছেন?"

কত কতদিন পরে এই কথাটা আবার ওর মুখে শুনলেন অখিলেশ! এই 'আমার ওপর রাগ করেছেন' কথাটা কতদিন পরে যে ও বলল আবার! মুহূর্তে কেন যেন অখিলেশের চোখে জল এসে পড়ল! একেবারেই কিছু বুঝতে না দিয়ে অখিলেশ বললেন, "মোটেই এতটুকু রাগ করিনি। আপনি আজ শুক্রবারেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন—তাই বললাম বাহ্।"

ফোনের ও-প্রান্তে আবার একই কথা, "না বলুন ঠিক করে, আপনি রাগ করেছেন? কী করব, দুপুরে ভিতরটা ছটফট করছিল, ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা মেসেজ করলাম, 'আজকে কি একবার যাব?' উত্তর সঙ্গে সঙ্গে এল, 'এসো'। তাই যাচ্ছি। আপনি সত্যি বলছেন তো রাগ করেননি?"

তখন অখিলেশের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। অখিলেশ স্বর খুব স্বাভাবিক রেখে বললেন, "একদম রাগ করিনি। আমি বাড়ি আছি, তাই মেসেজ করে জানিয়েছিলাম আপনাকে। ভালয় ভালয় ঘুরে আসুন। রাখছি এখন।"

একসময় অখিলেশের কাছে ভর দুপুরে ওর পাঠানো মেসেজ আসত, "আজকে কি একবার যাব?" অখিলেশ ভাবতেন, গত সন্ধ্যাবেলায়ই তো দেখা হয়েছে, আজকে আবার কেন? অবশ্য অখিলেশ আসতেই বলতেন ওকে। সেসব প্রথমদিকের কথা।

এরপর অখিলেশ একটা কাণ্ডই করলেন। পাগলের মতো একের পর এক কবিতা লিখে চললেন। সবই ওকে নিয়ে। ওর বন্দনা করে, ওর প্রতি মুগ্ধতা জানিয়ে লিখে চললেন একের পর এক কবিতা। আরও একটা কাণ্ড করলেন অখিলেশ। একটা-দুটো করে কবিতা লেখেন আর লিখেই ওকে ফোন করেন। যখন-তখন। দুপুরে যখন ও কলেজে তখন ফোন করেন। রাত্রে যখন ও বাড়িতে ফেরে তখন ফোন করেন। দুপুরে ও ক্লাসে থাকলে ফোন রিং হয়ে যায়। ক্লাস থেকে বেরিয়ে ও রিং ব্যাক করে। রাতে ন'টার পর ফোন করেন। কখনও দশটায়।

কেন ফোন করেন অখিলেশ?

কবিতা শোনাতে। যা যা কবিতা লিখছেন ওকে নিয়ে, সবই শুনিয়ে চলেন একের পর এক। কেবল বিকেল চারটে থেকে রাত সাড়ে আটটার মধ্যে কোনও ফোন করেন না অখিলেশ। ওই সময়টা ও এক্সপার্টের কাছে যায়, অখিলেশ জানেন।

পঞ্চাশটিরও বেশি কবিতা লেখা হয়ে গেল একমাসে। এই একমাসে ওর এ-বাড়িতে আসা আরও কমে গিয়েছে। এখন সপ্তাহে তিন চারদিন এক্সপার্টের কাছে যায় ও, অখিলেশ ফোনে জানতে পারেন। আর তত বেশি করে ওকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখে চলেন। কেমন মরিয়ার মতো কবিতা লিখছেন তখন অখিলেশ। সুরমা মাঝে মাঝে এ-ঘরে আসেন।

বলেন, "লিখছ? লেখো," বলেন, "চা করে দেবো?"

অখিলেশ বলেন, "না না। এই ভরদুপুরে চা কী হবে?"

সুরমা বলেন, "তোমার তো লেখার সময় চা দরকার হয়, তাই বলছিলাম।"

সুরমা চলে যান। অখিলেশ আবার ওকে ফোন করতে থাকেন। এইমাত্র নতুন যে-কবিতাটি লিখেছেন ওকে নিয়ে, সে-লেখা শোনাবেন।

লখনউয়ে সেমিনারে গেল ও! আবারও এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় খবর নিলেন অখিলেশ। লখনউয়ে পৌঁছনোর পর খবর নিলেন। রুমমেট কেমন হল, থাকার জায়গা কীরকম, দুপুরের খাওয়া, রাতের ডিনার ঠিকঠাক আছে কি না— সমস্ত খুঁটিয়ে খোঁজ নিতে লাগলেন ফোন করে করে— যেমন এত বছর ধরে করে আসছেন। ও সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। একেবারে প্রথম যখন ও অখিলেশের কাছে আসতে শুরু করল, তখনও ওকে এইরকম সব সেমিনারে কনফারেন্সে যেতে হত। ও বলত, "আমি ঠিকমতো পৌঁছলাম কি না, রাতে কোথায় থাকার ব্যবস্থা হল, এসবের কিছুই লোকজন খবর নেয় না। একটা ফোনও করে না লোকজন। কখন কলকাতায় ফিরব লোকজন জানতে চায় না।"

ও ওর স্বামীকে বলত লোকজন। তখনও ও স্বামীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করে। ওর স্বামী সকালে উঠে নিজের মতো তৈরি হয়ে বেরিয়ে যেত কাজে। ও-ও নিজের মতো প্রস্তুত হত বেরনোর জন্য। শ্বশুর বা শাশুড়ির সঙ্গে যেটুকু কথা হত স্বামীর সঙ্গে সেটুকু কথাবার্তাও ছিল না।

এই অবস্থা চলছিল সেই সময়টায় যখন ও প্রথম অখিলেশের কাছে আসে। অখিলেশ বুঝেছিলেন, ওর মন চায় কেউ ওর পৌঁছনোর খবর নিক, থাকার জায়গা ও ঠিকমতো পেল কি না তার খবর নিক, ওর খাওয়াদাওয়ার খবর নিক। বলত, "লোকজন তো কোনও খবরই নিল না। একটা ফোনও করল না, এই যে চারদিন আমদাবাদ থেকে ঘুরে এলাম, কারও কোনও মাথা ব্যথা নেই। এ-বাড়িতে আমি থাকি বা না-থাকি, লোকজনের কিছু এসে যায় না আসে না।"

অখিলেশ ফোন করে করে নিয়মিত খবর নিতেন ও কলকাতার বাইরে গেলেই। ও যে খুব খুশি হত সে কথা অখিলেশ বুঝতে পারতেন। ও খুশি হচ্ছে বুঝতে পেরে অখিলেশেরও মন ভরে উঠত।

এবার লখনউ যাওয়ার সময়, লখনউয়ে থাকার সময়, যতবার ফোন করলেন অখিলেশ, ও উত্তর দিল ততবারই। কেন যেন অখিলেশের মনে হল, উত্তরগুলো একটু দায়সারা। ফোনটা যেন তাড়াতাড়িই রেখে দেয় ইদানীং। আগে ফোন ছাড়তে চাইত না। কিন্তু তবু পিপাসার্তের মতো ফোন করে চললেন অখিলেশ। কখন ওর কনফারেন্স শেষ হবে জানলেন। জেনে, কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর বিকেলে ফোন করে কখন গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টে রওনা হবে খবর নিলেন। সন্ধ্যার পর ফ্লাইট। কলকাতা পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। রাত হয়ে গেলে কীভাবে অতদূর ফ্ল্যাটে ফিরবে সে খবর জানতে চাইলেন। ও তড়িঘড়ি উত্তর দিল, "এয়ারপোর্ট থেকে বেরনোর সময় প্রিপেড ট্যাক্সি নিয়ে নেব। এখন ফ্লাইট ধরবার তাড়া আছে। তাই রাখছি।"

ফোন রেখে দিল।

তবু অখিলেশ সন্ধে হতেই ফোন করলেন আবার। ও তখন সিকিউরিটি চেকিং পার হয়ে ফ্লাইটের জন্য গেট কখন খুলবে সেই অপেক্ষায় বসে আছে। গত কয়েকবছরে যখনই ও কোনও সেমিনার বা কনফারেন্সে যেত, সবসময়ই একটু অবকাশ বার করে নিয়ে কোনও একদিন বিকেল-সন্ধ্যায় একটু শপিং করত। এবং সুরমার জন্য কিছু না কিছু আনত। আনত টুকুনের জন্যও। সুরমা অখিলেশ প্রতিবারই বলতেন কী দরকার ছিল এসবের, কিন্তু মনে মনে দু'জনেই খুশি হতেন। অখিলেশের জন্যও কতবার কলম বা ডায়েরি অথবা সুদৃশ্য নোটবুক এনেছে। টুকুনই একমাত্র 'কী দরকার ছিল আবার' এই কথাটা বলত না। বলত, "খুব ভাল করেছ আমার জন্য এনেছ।"

এবার যখন অখিলেশ সন্ধেবেলা ফোন করে শুনলেন ও বিমানে ওঠবার অপেক্ষায় বসে আছে, জানতে চাইলেন, "কি, এবার কিছু শপিং করতে পারলেন?"

ও নিরাসক্ত গলায় বলল, "নাহ্! এবার আর শপিং করিনি। তার সময়ও ছিল না।"

অখিলেশ বললেন, "ঠিক আছে তবে। ল্যান্ড করার পর বাড়ি পৌঁছে আমাকে একটা ফোন বা মেসেজ করে দেবেন মনে করে।"

"আচ্ছা দেব," বলে ও ফোন রেখে দিল।

ওর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা উদাসীনতা অনুভব করছেন অখিলেশ। গত দেড়মাস বা তার কিছু বেশি সময় ধরে। যত একথা অনুভব করছেন, ততই ওর প্রতি মুগ্ধতা জানিয়ে প্রেমের কবিতা লিখে চলেছেন অখিলেশ।

আজকে সন্ধ্যায় ফোন রাখার পর অখিলেশ চিন্তা করলেন এবার কি লখনউয়ে ওর প্রেজেন্টেশন ভাল হয়নি? সেইজন্যই কি ও একটু অন্যমনস্ক অথবা ডিপ্রেসড হয়ে আছে?

এইসময় আবার অখিলেশের ফোন বেজে উঠল। অখিলেশ দেখলেন, ও ফোন করছে। ও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে ওর কণ্ঠস্বরের নিরাসক্তভাব অখিলেশকে বিমর্ষ করেছে, সেইজন্যই নিশ্চয়ই ও আবার ফোন করছে। অন্যত্র উৎসুকভাবে ফোন রিসিভ করলেন অখিলেশ, "হ্যাঁ,বলুন।"

ও প্রান্ত থেকে ওর স্বর বলল, "আপনাকে যে কালা শপিং করিনি, কথাটা পুরো ঠিক নয়।"

অখিলেশ খুশি হয়ে উঠলেন। নিশ্চয়ই অখিলেশের জন্য একটা কলম বা ডায়েরি কিনেছে। সেটাকে তা ঠিক শপিং বলা চলে না।

অখিলেশ ফোনে বললেন, "তা হলে একটু সময় পেয়েছিলেন দোকানপাটে যাওয়ার। ভালই তো। কী শপিং করলেন?

ওর উত্তর ভেসে এল, "শপিং বলা যায় না। কিছুই কিনিনি। কেবল একটা পাঞ্জাবি কিনেছি এক্সপার্টের জন্য।

অখিলেশের মন দপ করে নিভে গেল। মুখে বললেন, "ভাল করেছেন।"

হঠাৎই ওর গলায় খুব ব্যাকুলতার সুর এসে পড়ল, "আচ্ছা, উনি নেবেন তো পাঞ্জাবিটা? আপনার কী মনে হয়?"

অখিলেশ বলেন, "কেন নেবেন না? উনি খুব ভদ্রলোক। কেউ কিছু উপহার দিতে চাইলে নিশ্চয়ই নেবেন।"

একটু আশ্বস্ত শোনায় ওর গলা, "আপনি ঠিক বলছেন? উনি নেবেন তো?"

অখিলেশ নিজের গলায় বিশ্বাসের পুরো শক্তি ভরে দিয়ে বললেন, "বলছি তো, নিশ্চয়ই নেবেন উনি। আপনি চিন্তা করবেন না, কেমন?"

ফোন রেখে দেন অখিলেশ।

লখনউ থেকে ও কলকাতায় ফিরে আসার পর বেশ কিছুদিন পার হয়ে যায়, অখিলেশের বাড়ি আসা হয় না ওর। অখিলেশ কিন্তু নিয়মিত ফোন করছেন আর কবিতা শুনিয়ে চলেছেন। একবার শোনানো কবিতা আবারও শোনাচ্ছেন। ওকে একথাও জানিয়েছেন একাধিকবার যে, কবিতাগুলি সবই ওকে নিয়ে লেখা। একথা শুনে দু'বারই সামান্য একটু হেসেছে ও। ফোনে সেই সামান্য হাসির আভাস আরও সামান্য হয়ে ধরা দিয়েছে অখিলেশের কানে। সেইটুকুতেই, প্রত্যেকবার অখিলেশ উৎসাহবোধ করেছেন। ফোনে ওকে অনুরোধ করলেন অখিলেশ, "আপনি এসে এই কবিতাগুলো কপি করে দেবেন আমাকে? সেই আগের মতো?"

ও একবার বলল, "নিশ্চয়ই দেব। তবে কবে যে যেতে পারব সেকথা এক্ষুনি বলতে পারছি না। আপনাকে পরে ফোন করে জানাচ্ছি।"

দু'দিনের ভিতরেই জানাল, "আমি বৃহস্পতিবার যাব। দুপুরে। গিয়ে কপি করে দেব। একটা সিএল নিয়ে নেব সেদিন কলেজে।"

শুনে অখিলেশের আনন্দের আর সীমা রইল না। প্রতিদিনের যোগাযোগ অখিলেশ বহাল রাখলেন ফোনে। সাড়ে চারটে নাগাদ ও এক্সপার্টের চেম্বারে চলে যায় বলে ওই সময় থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ওকে আর ফোন করেন না অখিলেশ।

এখন কয়েকদিন দেখা হচ্ছে না বলে সকাল এগারোটা থেকে ফোন করতে শুরু করেন অখিলেশ। এগারোটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে অন্তত চারবার ফোন করবেনই করবেন। একটা-একটা করে দিন গুনছেন অখিলেশ। এখনও কবিতা লিখছেন। আর ভাবছেন বৃহস্পতিবার আসতে আর কত দেরি।

অবশেষে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অখিলেশের মনে পড়ল আজ বুধবার। তার মানে, আর একদিন পরেই ও আসবে। কবিতা কপি করে দেবে আগের মতোই। তবে এবার একটা বিশেষত্ব আছে। সব কবিতাই ওকে নিয়ে লেখা। একেবারে এতগুলি প্রেমের কবিতাও বহুদিন পরে লিখলেন অখিলেশ। ফলে খুব ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করছেন অখিলেশ ওকে দিয়ে কপি করানোর জন্য। কবিতাগুলি ওকে নিয়েই লেখা একথা জেনে যখন ও কপি করবে, তখন নিশ্চয়ই ওর মুখ খুব আলো ঝলমলে হয়ে উঠবে। একথা কল্পনা করেন অখিলেশ। এই কল্পনা অখিলেশকে আরও একটি কবিতা লিখতে উদ্দীপিত করে তোলে।

বুধবার আজ। আর মাত্র একদিন। ফলে আজ সমস্ত কবিতার রাফ কপিগুলি একত্র করে সাজাতে বসলেন অখিলেশ। কোন কবিতাটির পর কোন কবিতা কপি করাবেন সেটাই বিচার করতে লাগলেন খুব একাগ্রভাবে। কারণ, অখিলেশ এখন লক্ষ করে দেখছেন, কবিতার পর কবিতা যত লিখে গিয়েছেন তিনি, প্রেমের বহ্নিপ্রকাশ ততই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কবিতাগুলি কপি করার সময় ওর মনেও সেই ক্রমবিকাশ যেন নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে তাই এই পঞ্চান্নটি কবিতা নিয়ে অখিলেশ বসেছেন। কবিতাগুলি ছোট-ছোট, আকারে বড় নয়, কপি করতে বেশি সময় লাগবে না। ধৈর্য ধরে, ধীরে-ধীরে, পরপর লেখাগুলিকে বিন্যস্ত করতে লাগলেন অখিলেশ। আর একদিন পরেই ও আসবে। আজকের রাত্রিটি ভোর হওয়ার অপেক্ষা। প্রথমে সকাল, সকালের পর দুপুর। দুপুর থেকে আবার ওর সঙ্গে কবিতা কপি করতে বসবেন অখিলেশ। ও এসে পড়ার পরে যেন কোন লেখার পর কোন লেখা কপি করতে হবে সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না হয়— অখিলেশ সে বিষয়ে সতর্ক রইলেন।

রাফ কপিগুলিকে পরপর ঠিকভাবে সাজাতে গিয়ে কতখানি সময় চলে গিয়েছে অখিলেশ বুঝতে পারেননি। হঠাৎ খেয়াল হল দুপুর দুটো বেজে গিয়েছে। এখনও তো ওকে ফোন করা হয়নি একবারও। আশ্চর্য, ও-ও তো ফোন করেনি। অখিলেশ ফোন করলেন। একটানা রিং হয়ে গেল, ফোন ধরল না কেউ। আজ অখিলেশের বেরনো আছে। সন্ধ্যায় মিটিং। বিকেলেও মিটিং। স্নান-খাওয়া সেরে অখিলেশ আবার ফোন করলেন ওকে। ফোন বেজে গেল। কেউ ধরল না। আজকে কি তবে ইন্সপেকশন হচ্ছে ওদের কলেজে? সেইজন্যই কি ফোন ধরার সুযোগ পাচ্ছে না? ও একবার বলেছিল বটে, শিগগিরই নাকি ইন্সপেকশন হতে চলেছে ওদের কলেজে, এরকম খবর এসেছে। বিকেল হওয়ার আগেই অখিলেশ বেরিয়ে পড়লেন মিটিংয়ের জন্য। তার মধ্যে অন্তত তিনবার ফোন করা হয়ে গিয়েছে। সেই একই ফল হয়েছে প্রত্যেকবার। একটানা রিং হয়ে গিয়েছে। ফোন রিসিভ করেনি ও।

এবার অখিলেশ গভীর দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ন'বছর হয়ে গেল ওর সঙ্গে যোগাযোগ অখিলেশের। একদিনের জন্যও এমন ঘটনা ঘটেনি। অখিলেশ ফোন করলে ও যদি কোনও কারণে ফোন ধরতে সক্ষম না হয়ে থাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই রিং ব্যাক করেছে অখিলেশকে। তা ছাড়া শেষ এক-দেড় মাস বাদ দিলে, অখিলেশকে প্রত্যেকদিন প্রথম ফোন তো ও-ই করে এসেছে। অন্তত, গত ন'বছর ধরে এটাই হয়েছে।

খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন অখিলেশ। পাঁচ থেকে ছ'বার ফোন করলেন দুপুর থেকে, একবারও বলল না। রিং ব্যাকও করল না। কোনও বিপদে পড়েনি তো? ওর কোম্পানের বাড়ির ল্যান্ড লাইনের নম্বরও জানেন না অখিলেশ। ওর বাবা অথবা মায়ের ফোন নম্বর জানেন না। কী হল ওর? নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে।

গত ন'বছরের মধ্যে অন্তত তিনবার ইন্সপেকশন হয়েছে ওর কলেজে। তিনবারই ও নিজে ফোন করে জানিয়েছে— "জানেন তো, আজকে আমাদের কলেজে ইন্সপেকশন টিম এসেছে। কোনওমতে একটু সময় বার করে এলাম। কথা বলতে পারছি না।" গত ন'বছর ও একটাই কলেজে ছিল না। ওর বদলি হয়েছে অন্য কলেজে। সেই কলেজ থেকেও ফোন করে বলেছে, "দেখুন কী প্রবলেম। কলেজে ইন্সপেকশন হচ্ছে। আপনাকে যে ফোন করব তার সময়ই পাচ্ছিলাম না। এতক্ষণ। আজকে কখন ছাড়া পাব কলেজ থেকে কে জানে। ওরা চলে না গেলে তো কলেজ থেকে বেরোতে পারব না কেউ।"

হ্যাঁ, প্রত্যেকবার ও নিজে ফোন করে জানিয়েছে ইন্সপেকশন হওয়ার কথা। তা হলে আজকে কী হল? অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো? কার কাছে খবর নেবেন অখিলেশ?

প্রবল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পরপর তিনটে মেসেজ করলেন অখিলেশ, "কী হয়েছে আপনার? ফোন ধরছেন না কেন? ঠিক আছেন তো? শরীর সুস্থ আছে? দ্রুত জানান। আমি খুব চিন্তায় আছি।"

তিনটে মেসেজে এই কথাগুলিই এলোমেলোভাবে লিখলেন অখিলেশ। মিটিং শুরু হয়ে অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে যখন, তখন একটা উত্তর এল। একটি ইংরেজি বাক্য— ni, love u নয়— "I am ok. Call u later."

এমন অদ্ভুত মেসেজ এতদিনে কখনও ওর কাছ থেকে আসেনি। এত ফর্মাল মেসেজ? অত দৃশ্চিন্তার উত্তরও? যা হোক তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন অখিলেশ। যাক, কোনও বিপদে পড়েনি, অসুস্থও হয়নি। এটুকু অন্তত জানা গেল। যদিও মেসেজের ভাষা নিয়ে একটা খটকা রয়েই গেল অখিলেশের মনে। ইন্সপেকশন চলছে, ক্লাস নিচ্ছে, তার মধ্যেও ফোন ধরতে পেরেছে, "এখন ক্লাসে আছি, বেরিয়ে ফোন করছি।" কিন্তু এই ভাষায় কখনও মেসেজ করেনি, আশ্চর্য! ভাবতে ভাবতেই একটা মিটিং শেষ করে অন্য আর-একটি মিটিংয়ে গিয়ে যোগ দিলেন অখিলেশ।

সব কাজ সেরে বাড়ি পৌঁছতে রাত সাড়ে ন'টা বাজল অখিলেশের। মিটিংয়ে যোগদানকারী আর-একজন সদস্যও অখিলেশের সঙ্গে ফিরলেন একই গাড়িতে। তিনি অখিলেশের বাড়ির কাছেই থাকেন। সরকারি অফিসার। গাড়ি থেকে আর ফোন করতে পারেনি অখিলেশ সঙ্গে অন্য লোক থাকায়।

বাড়ি পৌঁছেই ফোন নিয়ে বারান্দায় এলেন অখিলেশ। বারান্দায় ভাল টাওয়ার পাওয়া যায়।

এবার ধরল ফোন, "হ্যাঁ বলুন।"

স্বাভাবিক উদ্বেগহীন স্বর।

কিন্তু অখিলেশের স্বর উদ্বেগহীন রইল না। কারণ, আজকে সারাদিন ধরে যেটা ঘটেছে— অর্থাৎ ও একবারও ফোন করেনি, একবারও ফোন ধরেনি— গত ন'বছরে সে-জিনিস কখনও ঘটেনি। এমনকী, 'I am ok. Call u later'-এর মতো মেসেজও আসেনি। সে-মেসেজ এসেছে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়, আর এখন বাজছে ন'টা চল্লিশ— এর মধ্যে একটা ফোনও আসেনি আর। 'Call u later' জানানো সত্ত্বেও আসেনি।

আকুল হয়ে জানতে চাইলেন অখিলেশ, "কী হয়েছিল আজ আপনার? আজ কি ইন্সপেকশন টিম এসেছিল কলেজে?" উত্তরে ও হাসল, "না না। আজকে তো ছুটি ছিল। বৃদ্ধপূর্ণিমার ছুটি। আসলে এক্সপার্ট ডেকেছিলেন হঠাৎ। জরুরি তলব। তাই যেতে হয়েছিল।"

তেরো

পরের দিন বেলা দুটোর সময় ও এসে পৌঁছল অখিলেশের বাড়িতে। অখিলেশের কাছে দু'জন ভদ্রলোক এসেছিলেন, কোনও একটি সভার নিমন্ত্রণ নিয়ে। অখিলেশ বিনম্রভাবে তাঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, ওই সভার দিন অখিলেশের অন্য কাজ আছে। যদিও এ-কথা সত্যি, তেমন কোনও জরুরি কাজ অখিলেশের নেই ওই নির্দিষ্ট দিনে। কিন্তু সভাসমিতির উদ্যোক্তাদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য এমন বানানো কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। উদ্যোক্তা দু'জন হতাশ মুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন চলে যাবেন বলে, বাইরের দরজা খোলাই আছে, ঠিক এইসময় খোলা দরজায় ও এসে দাঁড়াল। আজ শাড়ি পরেছে। ভদ্রলোক দু'জন ওর পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেলেন। ও মুখের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। রোদে মুখ রাঙা। অখিলেশের আজকেও আবার মনে হল সারা শরীর দিয়ে যেন আলো ঝরছে ওর। অখিলেশের চোখে যেন এত অপরূপ ওকে কখনও লাগেনি। অখিলেশের পড়ার ঘরে অখিলেশ ওকে নিয়ে বসলেন। ও বলল, "কই? কী কপি করতে হবে বলুন!"

অখিলেশ বললেন, "কপি নিশ্চয়ই করাব। কবিতাগুলো একবার শুনুন আগে।" ও বলল, "আচ্ছা বেশ। পড়ুন তা হলে।"

অখিলেশ পড়তে শুরু করলেন কবিতা। প্রতিটি কবিতাই আকারে ছোট, তবু প্রত্যেক লেখাতেই ওর উপস্থিতি স্পষ্ট বোঝা যায়। অখিলেশ কবিতা পড়ে চলেছেন, এক-একটা কবিতা পড়া শেষ করে কখনও-কখনও তাকাচ্ছেন ওর দিকে। ওর মুখ সেই একইরকম আলো-আলো হয়ে আছে। অখিলেশ বুঝতে পারছেন, এতগুলি কবিতা ওকে নিয়ে লেখা হয়েছে, সেই আনন্দে ও উজ্জ্বল। পাশের ঘরে সুরমা আছেন দুপুরের ঘুমে।

নতুন বহাল হওয়া কাজের বউটি রান্নাঘরে খুঁটিনাটি কাজ সারছে। সকাল আটটায় আসে ওই পরিচারিকা, রাত আটটায় যায়। দুপুরের দিকে রাত্তিরের রান্নার কাজ একটু এগিয়ে রাখে বউটি। অখিলেশের পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে হেলে পড়া রোদ্দুর এসে লাগছে ওর মুখে। অখিলেশ পড়া থামিয়ে বললেন, "আপনি একটু সরে বসুন, চড়া রোদ পড়ছে আপনার মুখে।"

ও বলল, "ঠিকই তো আছি। আপনি পড়ুন।"

অখিলেশ পড়ে চললেন আবার।

কবিতা পড়া শেষ হয়ে গেল বেশ তাড়াতাড়িই। অখিলেশ বললেন, "আজকে যা পড়লাম, সমস্ত কবিতাগুলিই আপনাকে নিয়ে লেখা।"

ও উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আপনি তো আগে এ-কথা বলেছেন আমাকে। ফোনে যখন কবিতাগুলি শুনিয়েছেন, তখনও মাঝে-মাঝে বলেছেন। জানি তো আমাকে নিয়ে লেখা। এবার খাতা একটা দিন। কপি করতে হবে তো।"

অখিলেশ বললেন, "দিচ্ছি, এই তো। হাতের কাছেই রাখা আছে। আর এই যে কলম।"

ও ব্যাগ খুলতে-খুলতে বলল, "কলম আছে আমার কাছে।"

অখিলেশ রাফ কবিতাগুলি আগেই টেবিলে বিছিয়ে নিয়েছিলেন। একের পর এক কবিতা লেখা চললেন দেখে-দেখে। খাটের উপর বসে ও কপি করে চলল স্পষ্ট হস্তাক্ষরে। এবার কপি করতে মোটেই বেশি সময় লাগছে না। কারণ আগের বার মনের মধ্যে ধরে রাখা কবিতা বলতে হত, তাতে সময় বেশি লাগত। কখনও বা মানস-লিখন পদ্ধতিতে পুরো একটি কবিতা তৈরি করতেন অখিলেশ। ততক্ষণ ওকে চুপ করে বসে থাকতে হত। এসব কয়েকবছর আগেকার কথা, যখন অখিলেশের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তাও অখিলেশ সারাক্ষণ চশমা পরে থাকতেন। কতবার এমন হয়েছে ও নিজে থেকে এগিয়ে এসে অখিলেশের চশমা দু'হাত দিয়ে খুলে নিয়েছে। বলেছে, "দিন তো, আপনার চশমাটা দিন তো আমাকে। এ মা! কত ধুলো পড়ে গেছে কাঁচে। এই চশমা পরে আছেন কী করে?" এ-কথা বলে বাথরুমে উঠে গিয়ে চশমার কাঁচে জলের ছিটে দিয়ে এনেছে। তারপর ভাল করে মুছেছে ওড়নায়। কখনও-কখনও তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি। মুখের ভাপ কাঁচে দিয়ে আবারও মুছেছে ভাল করে। চশমা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে, "দেখুন এবার আগের চেয়ে স্পষ্ট দেখছেন কি না?"

সেই মেয়ে এখন বসে-বসে অখিলেশের কবিতা কপি করছে, যে কবিতা শুধু তাকে নিয়েই লেখা।

হঠাৎ একসময় অখিলেশের মনে হল, ও তো কতদিন আসেনি। বেশ কিছুদিন পর আজকে এল এ বাড়িতে। পুরো সময়টা যদি কেবল ওকে নিয়ে কপিই করান অখিলেশ, তা হলে তো এর সঙ্গে কথাই বলা হবে না। একবার ভাল করে ওর দিকে তাকানোই হবে না। অখিলেশ কেমন ধৈর্যহারা হয়ে উঠলেন। ভিতরটা কেমন ছটফট করে উঠল তাঁর। ও এতক্ষণ বসে আছে, কপি করছে, অথচ অখিলেশ একবারও স্থির হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাননি। ওর আখিতারায় চোখ রাখেননি। অখিলেশ বলে উঠলেন, "একবার গুনে দেখুন তো, কতগুলো কবিতা কপি হল?"

খাতার পৃষ্ঠা উলটে-উলটে ও গুনতে শুরু করল। গোনা শেষ করে বলল, "সাঁইত্রিশটা হয়েছে। থার্টি সেভেন।"

অখিলেশ বললেন, "আজকে এই পর্যন্ত থাক। আর আঠারোটা কবিতা আছে। বাকিগুলো আর-একদিন এসে করে দিলেই হবে।"

অখিলেশের কথাটা শুনে হঠাৎ ও একটু আনমনা মতো হয়ে পড়ল। কথাটা শেষ করে ওর মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে ছিলেন অখিলেশ। দেখলেন, ওর মুখের ভাব কেমন যেন বদলে গেল। প্রায় স্বগতোক্তির

মতো প্রশ্ন করল, "আর একদিন?"

অখিলেশ চঞ্চলভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আর একদিন হবে। আজ থাক! আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলি। দাঁড়ান, চা দিতে বলে আসি আগে।"

অখিলেশ উঠে গিয়ে কাজের বউটিকে দু'কাপ চা দিতে বলে এলেন। ঘরে এসে দেখলেন, খাতার কবিতাগুলি ও একটি-দু'টি-তিনটি করে পড়ছে একমনে। অখিলেশ খুশি হয়ে উঠলেন। নিজের সম্পর্কে ভাবলেন, 'যে-নারী আমাকে ভালবাসে, তাকে নিয়েই কবিতা লিখলাম, আবার সেই নারীই এসে নিজে হাতে কপি করে দিল। এখন সেই কবিতাই সে পড়ে দেখছে— এত সৌভাগ্যবান পুরুষ আমার মতো আর ক'জন আছে?'

এই খুশি নিজের মধ্যে আটকে রাখতে পারলেন না অখিলেশ। বলে ফেললেন, "এইমাত্র তো লেখাগুলি নিজেই কপি করলেন আপনি, আবারও পড়ছেন?"

ওর উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত হল, "এই একটু দেখছিলাম।"

অখিলেশ ভাবলেন, এই-ই তবে অখিলেশের জীবনের এক সার্থক মুহূর্ত। নিজেকে নিয়ে লেখা যে-কবিতাগুচ্ছ তা কি মাত্র একবার পড়লে হয়? বারবার পড়তে ইচ্ছে করে। অখিলেশ ভাবেন, "আমি আর কী-ই-বা দিতে পারতাম ওকে? শুধু কয়েকটা কবিতা ছাড়া তো আর কিছু দিতে পারব না। সেটুকুই দিলাম। সেটুকুই দিয়েছি আজ। আমার জীবনের আয়ত্তের মধ্যে আর কিছুই তো নেই, ওকে দেওয়ার মতো। এই পঞ্চান্নটি কবিতার গুচ্ছ, যা আমার জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছে ওর জন্য সামান্য উপহাররূপে। কত বড় ভাগ্য আমার যে, আমার সামনে বসে ও সেসব কবিতা পড়ছে।"

চা দিয়ে গিয়েছে কাজের বউটি। অখিলেশ তাঁর পড়ার টেবিলে। ও খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে। খাতাপত্র বন্ধ করে রাখা হয়েছে এখন।

ও বলল, "আপনাকে একটা কথা বলার আছে।"

অখিলেশ ভাবছেন, নিশ্চয়ই কবিতাগুলি সম্পর্কে ওর মুগ্ধতা জানাবে। কবিতাগুলি সবই ওকে ফোন করে শুনিয়েছেন অখিলেশ, একথা ঠিক, কিন্তু নিজে পড়া তো আলাদা ব্যাপার। নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে এতগুলি কবিতা রচিত হওয়ায় ও অভিভূত হয়ে আছে।

অখিলেশ স্বচ্ছন্দে বললেন, "বলুন, কী বলবেন।"

ও বলল, "ডোন্ট গেট হার্ট। আই অ্যাম ইন আ রিলেশনশিপ," বলে কাপ উঠিয়ে চায়ে চুমুক দিল।

অখিলেশের মনে হল, বুকের ঠিক মাঝখানে অখিলেশের শ্বাস আটকে গিয়েছে।

অখিলেশ বলেন, "ক্-কী বললেন?"

ও থেমে থেমে শান্ত গলায় বলল, "আই অ্যাম ইন আ রিলেশনশিপ। ডোন্ট গেট হার্ট।"

অখিলেশ তক্ষণেৎ আটকে যাওয়া শ্বাস আবার নিতে পেরেছেন। বললেন, "অভিনন্দন। দেখবেন এবার থেকে আর আপনার নিজেকে ব্যর্থ বলে মনে হবে না।"

অখিলেশ খেয়াল করলেন তাঁর ভিতরটা থরথর করে কাঁপছে। চায়ের কাপটা ধরতে গিয়ে দেখলেন হাত কাঁপছে ভালরকম। অখিলেশ কাপের হ্যান্ডেল ধরেও ছেড়ে দিলেন, আর তুলতে চেষ্টা করলেন না।

ও চায়ের কাপ শেষ করে প্লেটে নামিয়ে রাখল। তারপর ব্যাগ খুলে মোবাইল বের করল। উবুর ডাকছে।

অখিলেশ বললেন, "এ কী? এখনই উঠে পড়ছেন?"

ও বলল, "সাই আজ একটু তাড়া আছে।" বলেই উঠে পড়ল ও।

অখিলেশের চা শেষ হয়নি। অর্ধেক চা ভর্তি কাপ ফেলে রেখে অখিলেশ অনুসরণ করলেন ওকে।

ও দরজা খুলল, বাইরে বেরোল, ঘুরে তাকাল না। বাইরের দিকে ওর মুখ। অখিলেশ ওর পিছনে দরজায় দাঁড়িয়ে। ও মুখ না ঘুরিয়ে বাইরের বাতাসের প্রতি বলল, "সাবধানে থাকবেন।"

অদৃশ্য হয়ে গেল ও।

অখিলেশ পড়ার ঘরে ফিরে এলেন। চায়ের অর্ধেক ভরা কাপ এখনও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ঠান্ডা। আর খেলেন না তিনি। নিজের অর্ধেক ভরা কাপ আর ওর পুরো শূন্য কাপ দু'টি দু'হাতে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন, কাজের বউটির কাছে নামিয়ে দিয়ে আসবেন।

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে মাঝখানের বসবার ঘরটুকু পার হতে হতে অখিলেশ ভাবলেন, এই কাপ দু'টি অখিলেশের ঘরে পৌঁছেছিল মিনিট পনেরো আগে। এখন কাপ দু'টি ফেরত যাচ্ছে। এই পনেরো মিনিটে তাঁর জীবন বদলে গিয়েছে।

চোদ্দো

সেদিন রাত্রে বহু চেষ্টাতেও ঘুমোতে পারলেন না অখিলেশ। ঘুমের ওষুধ অখিলেশকে প্রতিদিনই খেতে হয়। চারটি ওষুধ রাতে শোওয়ার আগে নিয়মিত খাওয়ার কথা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনেই আছে। দিনে তিনবার ব্লাডপ্রেশারের ওষুধও লিখে দিয়েছেন তাঁর ডাক্তার। ঘুম না হলে অখিলেশের ব্লাডপ্রেশার উর্ধ্বগামী হয়, তাই ঘুমের ওষুধের এই ব্যবস্থা। সেদিন রাত্রে যখন কিছুতেই ঘুম আসছে না, তখন রাত আড়াইটার সময় দু'রকম ঘুমের ওষুধই তিনি আরও দু'টি করে খেয়ে নিলেন। তাতেও ঘুম এল না। অখিলেশ পাখির ডাক শুনতে পেলেন শেষরাত্রে, এবং তারও কিছুক্ষণ পর বাইরে দেখতে পেলেন ভোরবেলার আলো।

শেষরাতের পাখির ডাক এবং জানলায় ভোরবেলার ফুটে ওঠা কিছুই অখিলেশ উপভোগ করতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর মনে সারারাত ধরে একটা কথাই বেজে চলেছে, "ডোন্ট গেট হার্ট। আই অ্যাম ইন আ রিলেশনশিপ।"

অখিলেশ সকাল এগারোটায় ওকে একটা ফোন করলেন, নিয়মমতোই। ফোন বেজে গেল, ও ধরল না। দুপুর একটা ও বিকেল চারটেয় আরও দু'বার ফোন করলেন তিনি। দু'বারই কেবল রিং হওয়ার আওয়াজ পেলেন। ফোন রিসিভ করল না ও। তখন অখিলেশ একটি কাতর মেসেজ করলেন। এইভাবে পরবর্তী তিনদিনে একুশটি ফোন কল এবং উনিশটি মেসেজ করে গেলেন তিনি। একটিরও কোনও উত্তর পেলেন না। না ফোনের, না মেসেজের।

এদিকে তাঁকে কাজে বেরোতে হচ্ছে, মিটিং-এ যেতে হচ্ছে। একটি সভায়ও যেতে হল। অখিলেশ সভার প্রথম সারিতে বসে আছেন, একজন উদ্যোক্তা ফিসফিস করে কানে কানে বলে গেলেন, "এই যে, ইনি বলছেন, বুধাদিত্য সেন, এঁর বলা শেষ হলেই আপনাকে ডাকা হবে স্যার! আপনার ভাষণ স্যার এরপরেই।"

তড়িদাহতের মতো 'স্যার' শব্দটি চাবুক মারল অখিলেশকে। 'স্যার' শব্দটা ওর মুখে শুনেছেন অনেকবার। এখন তিনি ওই শব্দটা সহ্য করতে পারছেন না! নিজের মনের দাবানল থেকে সাময়িক নিস্তার পাওয়ার জন্য অখিলেশ বুধাদিত্য সেনের ভাষণটি শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন। বুধাদিত্য সেন ফিল্ম বিষয়ে লেখেন এবং বলেন। ফিল্ম বিষয়ে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ বলাই উচিত। ইনি ভাল বলেন। ভাষণটি শুনতে গিয়ে অখিলেশ দেখলেন ভাষণের কোনও কথাই অখিলেশের কানে ঢুকছে না। পরিবর্তে অখিলেশ নিজের অজান্তেই বুধাদিত্য সেনের সঙ্গে নিজের তুলনা করে চলেছেন। ইনি তো দেশের রায়ের সাহিত্যের অনুরাগী। এঁদের জীবন, এঁদের মনের গঠনপ্রণালী অখিলেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। এদের জীবনযাপন পরিকল্পিত, রচনা পরিকল্পিত, নিখুঁত। এঁরা মাটির উপর পা রেখে শক্তভাবে দাঁড়ানো মানুষ। এঁরা কেউ কখনওই পরিণত বয়সে পৌঁছে তাঁর মতো এমন কোনও কাজ করে বসবেন না এবং মনের ভিতর কোনও প্রচ্ছলিত হুতাশন বহন করে বেড়াবেন না আহোরাত্র। হীনমন্যতায় এবং আত্মগ্লানিতে কুঁকড়ে যেতে যেতে অখিলেশ বুঝতে পারলেন, বুধাদিত্য সেনের ভাষণটি তিনি অর্ধমনস্কভাবেও শুনছেন না। মাঝে মাঝে দু'-তিনটি বাক্য যা অখিলেশের মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে, তার ফলে অখিলেশ বুঝতে

পারছেন খুব গুছিয়ে, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত উপযুক্ত মাত্রায় বণ্টন করে ভাষণটি উপস্থিত করছেন বুধাদিত্য সেন। তা ছাড়া এদের গোষ্ঠীর সকলের মধ্যেই একটা শক্তপোক্ত আদর্শবাদ আছে। যে-আদর্শবাদ কিছুতেই জীবনকে জীবন থেকে একচুখানিও বাইরে চলকে পড়তে দেয় না।

"আমি কেন এরকম হতে পারলাম না?" নিজেকে প্রশ্ন করে চলেন অখিলেশ।

বুধাদিত্য সেন কখনওই সুদীর্ঘ ভাষণ দেবেন না, সেই পরিমিতি বোধ তাঁর আছে। বুধাদিত্য সেন এখন বলছেন, "আর একটি মাত্র প্রশ্ন বা সূত্র শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরে আমার কথা আমি শেষ করব।"

অখিলেশ ভাবলেন, "এই প্রসঙ্গটি, অর্থাৎ একেবারে শেষে ইনি যা বলবেন, সেটুকু মন দিয়ে শুনে রাখি। তা হলে অন্তত আমার বলাটুকু আরম্ভ করতে পারব। বুধাদিত্য সেনের ভাষণের রেশ ধরে।"

এইসময় অখিলেশের পাঞ্জাবির বুকপকেটে রাখা মোবাইল ফোন দু'বার কেঁপে উঠল। সভায় আছেন অখিলেশ তাই ভাইব্রেশন মোডে রাখা আছে ফোন, যাতে সভা চলাকালীন সশব্দে বেজে না ওঠে।

ফোনের এই কম্পনে অধীর আকুল হয়ে উঠলেন তিনি। উনিশটি মেসেজ করেছেন, একুশটি ফোন। ফোন না ধরুক, মেসেজের উত্তর নিশ্চয়ই দিয়েছে।

ভাষণ চলছে। পকেট থেকে মোবাইল তুলে নিয়ে ফোনের পরদায় চোখ রাখলেন অখিলেশ।

হ্যাঁ, ওরই কথা বহন করছে মেসেজ। মেসেজটি পাঠিয়েছেন ওর ল-ইয়ার। অখিলেশ ও সুরমার নির্বাচিত সেই উকিল ভদ্রলোক। যাকে ও সারাক্ষণ এক্সপার্ট নামে অভিহিত করে। সেই এক্সপার্টই পাঠিয়েছেন মেসেজটি।

ওর উকিল লিখেছেন ওর নাম করে যে, ও সেই ল-ইয়ারকে জানিয়েছে, ও আর কখনও অখিলেশের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেইসঙ্গে ও একথাও জানিয়েছে, ভবিষ্যতে কখনও যেন ফোন বা মেসেজ করে অখিলেশ ওকে বিরক্ত না করেন।

মেসেজটা পড়া শেষ করে অখিলেশ ফোন হাতে সভার প্রথম সারিতে চুপ করে বসে আছেন। এইসময় পাশের ব্যক্তি অখিলেশের বাহুতে সামান্য ঠেলা দিয়ে বলছেন, "আপনার নাম ঘোষণা হচ্ছে, যান অখিলেশবাবু, এবার আপনার বলা তো!"

বুধাদিত্য সেনের ভাষণ শেষ হয়েছে, তিনি মঞ্চ থেকে নেমে গিয়েছেন। সভার ঘোষক দু'বার অখিলেশের নাম ঘোষণা করেছেন মাইকে, অখিলেশ চুপ করে বসে আছেন তো বসেই আছেন। কিছুই তাঁর কানে ঢুকছে না।

পাশের ব্যক্তি, তিনিও অন্যতম বক্তা, গায়ে ঠেলা দিয়ে বলার পর অখিলেশের চেতনা ফিরল। তিনি প্রথম সারি থেকে সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠলেন। মিনিট দশেক কিছু একটা বললেন। তারপর নেমে এলেন। কীভাবে মঞ্চে উঠলেন আর কী কী বললেন, কিছুই আর অখিলেশের মনে রইল না।

উকিলকে দিয়ে মেসেজ করাতে হল শেষ পর্যন্ত? এই কথাটুকু কি নিজে মেসেজ করে বলা যেত না? তা ছাড়া অখিলেশ কি কখনও ওকে বিরক্ত করেছেন? এই কথাগুলি মাথার ভিতর পাক খেয়ে চলল অখিলেশের।

সেদিন রাত্রে সব মিলিয়ে চোদ্দোটি ওষুধ খেতে হল অখিলেশকে। যত রাত বাড়ে, তত কষ্ট বাড়ে। কেবলই মনে পড়ে টানা টানা চোখ, চোখের তলায় হালকা কাজলরেখা, দীপ্ত উজ্জ্বল দু'টি আঁখিতারা—অখিলেশের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে ভেসে ওঠে বই পড়ে শোনাতে শোনাতে এক-একবার মুখ তুলে অখিলেশের দিকে তাকানো। আরও কত মুহূর্ত যে মনে পড়ে! অখিলেশ ঘুমোতে পারেন না। ওষুধের ছ্রিপ, অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নেন বালিশের পাশ থেকে। দুটো বা তিনটে মুখে দিয়ে দেন। এই ওষুধগুলো মুখে দিলে গলে যায়। জল দিয়ে গিলে খেতে হয় না। একদিন ষোলোটি ওষুধ খেয়েও ঘুম এল না অখিলেশের। শেষরাত্রে আবার অখিলেশ পাখির ডাক শুনলেন, জানলায় আবারও দেখলেন ভোরের আলো ফুটে উঠছে।

সেইদিনে অখিলেশের পড়ার ঘরে চা দিতে এসে সুরমা দেখলেন অখিলেশ জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন, আর অখিলেশের চোখ থেকে নামছে জলের ধারা। নাক দিয়ে শিকনি বেরিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাঞ্জাবির বুকপকেট পর্যন্ত চলে এসেছে।

হ্যাঁ, বহুক্ষণ ধরে একনাগাড়ে অশ্রুপাত করে চললে শিকনি বেরিয়ে পাঞ্জাবির বুকপকেটের কাছে এসে ঝুলতে পারে।

সুরমা চমকে গেলেন, "কী হয়েছে তোমার? এভাবে কাঁদছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?" সুরমা অসম্ভব উদ্বেগভরা গলায় জানতে চাইলেন।

ধরা পড়ে গিয়ে অখিলেশ চোখ মুছলেন হাত দিয়ে। সর্দি মোছার কিছু খুঁজে না পেয়ে দ্রুত উঠে বাথরুমে গেলেন। নাক ঝাড়লেন। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ মুছলেন বাথরুমে ঝুলিয়ে রাখা টাওয়ালে।

বাথরুমের বন্ধ দরজার ওপারে সুরমার গলা, "কী হল? দরজা খোলো। শরীর খারাপ লাগছে? ঠিক করে বলো," বন্ধ দরজার ভেতর থেকে কান্নাভাঙা গলায় উত্তর দেন অখিলেশ, "আমি ঠিক আছি।"

দরজার ওপার থেকে সুরমার গলা শোনা যায়, "না, ঠিক নেই তুমি। তোমার গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে ঠিক নেই। ডাক্তার দত্তকে ফোন করব?"

অখিলেশ আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। কোনওমতে বললেন, "না ডাক্তার দত্তকে ফোন কোরো না। আমাকে বেরোতে দাও বাথরুম থেকে। আসছি এক্ষুনি।"

অখিলেশ মুখে আবার জলের ঝাপটা দিয়ে টাওয়েল চেপে ধরলেন মুখে। কান্না উপচে উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে এখনও। মুখ চেপে চেপে মুছে ফেলার ওইটুকু সময়ের মধ্যে অখিলেশের মনে হল, এখন আমি কী করব? কার কাছে যাব? পরক্ষণে ভাবলেন, সুরমার সঙ্গে পঁচিশ বছর একসঙ্গে আছেন। এতদিনের সঙ্গী সুরমা। কোথাও তো তাঁর দু'জন বন্ধুও, অখিলেশ আর সুরমা। সুরমাকে কি বলে দেওয়া যায়? অখিলেশের মন চাইছে কারওর কোলে মাথা রাখতে। কারওর কাছে গিয়ে ভেঙে পড়তে। সুরমার কাছে আর লুকিয়ে কী লাভ?

অখিলেশ ভাবলেন, সুরমা নিশ্চয়ই আমাকে বুঝবে। তা ছাড়া লুকিয়ে রাখার ক্ষমতাও তো তাঁর নেই এখন। পরপর ছ'দিন রাতে না ঘুমিয়ে সপ্তম দিন সকাল থেকে অখিলেশের চোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরতে শুরু করেছে। দিনরাত্রি একাকার হয়ে যাওয়া এক কষ্ট এখন। কেবলই মনে হচ্ছে, উকিলকে দিয়ে না জানালে কি চলছিল না? আমি কি কোনও কঠোর ব্যবহার করেছি কখনও? আমাকে একবার জানানো যেত না আমার দোষটা কী? আমি নাহয় সেই দোষ সংশোধন করে নিতাম। যদি কোনও দোষ করে থাকি তা তো না জেনে করেছি।

আবার মনে মনে কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন অখিলেশ, বাথরুমের নির্জনতা পেয়ে। দরজায় এবার ধাক্কা দেওয়ার আওয়াজ। সুরমার গলা, "কী করছ? এত দেরি হচ্ছে কেন বেরোতে?"

বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়েই সুরমার সামনে পড়লেন অখিলেশ। অসম্ভব বিস্ময় আর দুশ্চিন্তা মেশানো মুখ সুরমার। সুরমা ভাবছেন, কী হল এই লোকটার? সুরমা একটা হাত বাড়িয়ে বাহু চেপে ধরলেন অখিলেশের, বললেন, "দাঁড়াও, আমাকে বলো কী হয়েছে? কোনও খারাপ খবর এসেছে?"

উত্তর দিতে গিয়ে গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে এল অখিলেশের। একটা ফোঁপানি উদ্গত হয়ে উঠল। অখিলেশের মনে হল, এই তো একজন আছে যে তাঁর সমস্ত কথা শুনতে চাইছে। তিনি তখন আবার ফুঁপিয়ে উঠছেন, আবারও। তাঁর চোখ জলে ভরে যাচ্ছে, গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে অশ্রুধারা।

সুরমা এবার আকুল হয়ে বললেন, "কী হয়েছে তোমার বলো না গো? আমাকে সব খুলে বলো!"

অখিলেশ কান্নাধরা গলায় বললেন, "ও চলে গিয়েছে।"

সুরমা অখিলেশের পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে। অখিলেশ

খাটের ওপর বসে আছেন। সুরমা আরও আকুল বিস্ময়ে বললেন, "ও চলে গিয়েছে? মানে কী? ও মানে কে?"

অখিলেশ বহু কষ্টে ওর নামটি উচ্চারণ করলেন।

সুরমা বললেন, "ও কোথায় চলে গিয়েছে? সে কী! ওর কি খারাপ কিছু ঘটেছে?"

অখিলেশ রুদ্ধ গলায় বললেন, "না ওসব চিন্তা কোরো না। ও ভাল আছে।"

সুরমা কিছুই বুঝতে পারেন না, বলেন, "তা হলে ও চলে গিয়েছে বলছ কেন?"

অখিলেশ কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করে আবারও ব্যর্থ হন। তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে থাকে। কথা বলতে পারেন না অখিলেশ। সুরমা তাঁর কাঁধে হাত রাখেন। বলেন, "তুমি এমন করছ কেন গো? আমাকে বলো। বলো আমাকে। দেখি কী করা যায়।"

সুরমার গলায় আশ্বাস আর উৎকণ্ঠা দুই-ই মিলেমিশে আছে। অখিলেশ কোনওমতে বলেন, "ওর জীবনে একজন প্রেমিক এসেছে। ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।"

সুরমা প্রথমে যেন ঠিক বুঝতে পারেন না কথাটা। বোঝার চেষ্টা করতে থাকেন। বলেন, "ওর জীবনে একজন প্রেমিক এসেছে? আর ও তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে? এর মানে কী?"

সুরমার মুখের চেহারা দ্রুত বদলাতে থাকে। সুরমা অখিলেশের কাঁধের ওপর থেকে কাঁটিহি হাত সরিয়ে নেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের বিস্ময় বদলে যায় কঠোরতায়। বলেন, "তার মানে? ও তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে মানে তোমাদের মধ্যে প্রেম ছিল? ওই ঘরে বসে প্রেম করতে তোমরা? আর আমি কিছু বুঝতে পারিনি? অ্যাঁ?"

সুরমার গলা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ। মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

অখিলেশ বলেন কাতরভাবে, "আমার কথাটা শোনো। ও আমাকে দু'দণ্ডের শান্তি দিয়েছিল। ওর কাছে আমি একরকম শান্তি পেতাম।"

সুরমা এবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। চিৎকার করে বলেন, "যাও যাও। ওসব ন্যাকা কথা বলতে এসো না। তাই বলি, মেয়েটার সঙ্গে সেই দুপুর থেকে রাত সাড়ে আটটা-ন'টা পর্যন্ত একনাগাড়ে কথা বলে যেতে কেন? কী কারণে? কী এত কথা? ভগবান! শেষে এই ছিল আমার কপালে!"

অখিলেশ খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন, "শোনো, আমরা গীতবিতান খুলে কথা বলতাম, রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে কথা বলতাম..."

সুরমা ফুঁসছেন ক্রোধে। বলছেন, "গান নিয়ে কথা বলতে? আমাকে ওসব বোঝাতে এসো না। এতখানি বয়সে পৌঁছে অত অল্পবয়সি একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম? আবার বলছে, ও আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে! ঈশ্বর! আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আমি আর তোমার সঙ্গে থাকব না। থাকব না, থাকব না, থাকব না।"

থাকব না বলতে বলতে দেওয়ালে সজোরে নিজের মাথা ঠুকতে থাকেন সুরমা। অখিলেশের কান্না থেমে গিয়েছে। এ কী হল? অখিলেশ গিয়ে সুরমার দুটো কাঁধ চেপে ধরেন। বলেন, "এমন কোরো না। মাথায় লেগে যাবে। এভাবে মাথা ঠুকো না।"

সুরমা জোরালো একটা ধাক্কায় অখিলেশকে সরিয়ে দেন। বলেন, "খবরদার, ছোঁবে না আমাকে। আমার কাছে আসবে না। ওই হাতে আমাকে ধরবে না যে-হাতে ওকে ধরেছ।"

অখিলেশ নিজের শেষ শক্তি দিয়ে বলেন, "আমি কখনও ওকে স্পর্শ করিনি, বিশ্বাস করো। কোনও কিছু হয়নি আমাদের মধ্যে। তুমি যা ভাবছ। ওর কাছে আমি শান্তি পেতাম। তুমি ওরকম কোরো না।"

"করব করব, একশোবার করব," বলে দেওয়ালে আবার মাথা ঠুকতে থাকেন সুরমা। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে দেওয়ালের সামনে থেকে সুরমাকে সরিয়ে আনেন অখিলেশ। সুরমা অখিলেশের বুকে কিল মারতে মারতে বলেন, "দুশ্চরিত্র! লম্পট! নিজের বউয়ের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে গিয়েছ এতদিন আর আমি কিছু বুঝতে পারিনি!" বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন সুরমা। সামনের খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গোঁজেন। অখিলেশের বালিশ। কান্নার ধাক্কায় সুরমার কথা ভেঙে-ভেঙে যায়। স্পষ্ট হয় না কথা। কাজের বউটি এসে দরজায় দাঁড়ায়। অখিলেশ তাকে ইশারায় চলে যেতে বলেন। বউটি ঘরের দরজার সামনে থেকে সরে যায়। একটা কথাই বারবার বলে চলেন সুরমা, "আমি তোমাদের বিশ্বাস করেছিলাম... আমি বিশ্বাস..."

অখিলেশ সুরমাকে ডাকতে আর সাহস পেলেন না। কাছে গিয়ে ঝুঁকে একবার মাথায় হাত রাখলেন। বালিশ থেকে মুখ তুললেন সুরমা। কান্নার চাপে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে দুমড়ে যাচ্ছে। অখিলেশ, "একবার বলেছি আমাকে ছোঁবে না। আর-একবার যদি আমার গায়ে হাত রাখো, আমি বাথরুমে গিয়ে ওই অ্যাসিডের শিশিটা গলায় ঢালব।"

শিউরে উঠলেন অখিলেশ। সম্পূর্ণ উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন এখন সুরমা। সুরমার গলা শোনা গেল, "তুমি যাও। এ ঘর থেকে যাও। আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকো না।"

অখিলেশ ধীরে-ধীরে বাইরের ঘরে এসে বসলেন।

সুরমা ওঘর থেকে কান্না মেশানো গলায় চিৎকার করে উঠলেন, "শোক? শোক উথলে উঠেছে, তাই না? প্রেমিকা জোড়া পায়ে লাথি মেরে চলে গিয়েছে তাই শোক? চিক হয়েছে! উপযুক্ত শাস্তি! ঠিক করেছে মেয়েটা। ঈশ্বর, এইরকম স্বামী নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে এখনও?" কান্নার দাপটে আবার গলা বুজে এল সুরমার।

কাজের বউটি আবার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সুরমার ঘরের দিকে যাচ্ছিল, অখিলেশ হাতের ইশারায় তাকে রান্নাঘর দেখালেন। কাজের বউটি রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

অখিলেশ এখন বাইরের ঘরের সোফায় বসে আছেন স্তব্ধ হয়ে। ঘরের ভিতর থেকে সুরমার কান্নার আওয়াজ আর ক্রন্দন-জড়িত কিছু বিলাপবাক্য ভেসে আসছে। স্বগতোক্তির মতো কথা বলে যাচ্ছেন সুরমা কান্নার ফাঁকে-ফাঁকে, সেসব কথা এই বাইরের ঘরে পৌঁছে সম্পূর্ণ জড়ানো ও দুর্বোধ্য ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছে।

এখন কী করবেন অখিলেশ?

অখিলেশের মনে হল সোফায় বসে থাকা তাঁর শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইছে। অল্প-অল্প করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলেন অখিলেশ। একসময়, সোফায় ওইরকম উপবিষ্ট অবস্থায় থাকাকালীন অখিলেশের কপাল স্পর্শ করল তাঁর হাঁটু। একটু যেন আরাম বোধ হল না? অখিলেশ আবার সোজা হয়ে বসলেন। বসার একটু পরেই আবার ঝুঁকে পড়তে শুরু করলেন। ঝুঁকতে-ঝুঁকতে একসময় অখিলেশের কপাল আবার ঠেকে গেল তাঁর হাঁটুতে...।

পনেরো

এরপর এক সপ্তাহের বেশি সময় পার হয়েছে। সুরমা অখিলেশকে ছেড়ে সুরমার এক বান্ধবীর বাড়ি উঠেছেন। এই বান্ধবীটি একজন লেখিকা। অখিলেশের সূত্রেই তাঁর এ বাড়িতে আসা আর সুরমার সঙ্গে পরিচয়। এখন সুরমা আর লেখিকার পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত। এতটাই যে, সেদিন বিকেলেই সুরমা একটা কেস করে ওঁকে সব জানিয়ে দেন এবং বলেন, "আমি আজকেই তোমার বাড়িতে চলে যেতে চাই। তোমার অখিলেশদার সঙ্গে আর আমি থাকতে পারছি না। একজন মিথ্যেবাদী, লম্পট লোক।" অখিলেশ পাশের ঘরে বসে-বসে সুরমার সব ফোনই শুনতে পাচ্ছিলেন। সব ফোন মানে সুরমা যে শুধু সেই লেখিকাকেই ফোন করছিলেন তা নয়, লেখিকাকে ফোন করার পর অখিলেশদের কয়েকজন পারিবারিক বন্ধুকেও ফোন করেন সুরমা। এই পারিবারিক বন্ধুরা পারিবারিক বন্ধু হয়েছেন কীভাবে? এঁদের সকলেরই প্রথম অখিলেশের সঙ্গে পরিচয় হয় অখিলেশের লেখার সূত্রে। তারপর অখিলেশের বাড়িতে তাঁদের আসা-যাওয়া আরম্ভ। সুরমা প্রতিবছর বাড়িতে দুর্গাপুজো ও গণেশ চতুর্থীর পুজার আয়োজন করেন। তখন এই সমস্ত পারিবারিক বন্ধুরা সুরমার নিমন্ত্রণ পেয়ে উপস্থিত হন।

অখিলেশের পরিচিতরাই এখন ফোন পাচ্ছেন সুরমার কাছ থেকে এবং অখিলেশ কতদূর দুশ্চরিত্র সেকথা জানতে পারছেন। সেসব বন্ধুরা এইরকম ফোন পেয়ে কে কীরকম প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন সেসব কথা আর অখিলেশ শুনতে পাচ্ছেন না। কারণ, ফোন হাতে রাখা হচ্ছে অন্য ঘর থেকে, তা হলেও ফোনে কী বলা হচ্ছে সেসব অখিলেশ শুনতে পাচ্ছেন— কিন্তু ফোনের উত্তরে কী বলা হচ্ছে তা তো আর অখিলেশের কানে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

অখিলেশের কান্না থেমে গিয়েছে। অখিলেশ সোফায় এক়া বসে ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ছেন। অখিলেশের কপাল মাঝে-মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাঁর হাঁটু।

সেদিন সন্ধেবেলা একটা ব্যাগে কিছু জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে ডেকে সুরমা বেরিয়ে গেলেন। অখিলেশকে কিছুই বলে গেলেন না। রাত ন'টা বাজল, দশটা বাজল— সুরমা ফিরলেন না। ড্রাইভারকে ফোন করে অখিলেশ দু'টি তথ্য জানতে পারলেন। এক, সুরমা নেমে গিয়েছেন সেই লেখিকার বাড়ি। দ্বিতীয় তথ্যটি হল, ড্রাইভার এখন দাঁড়িয়ে আছে একটা ক্যাফের সামনে, সেখান থেকে দিদিকে তুলে বাড়ি আসবে।

দিদি, মানে টুকুন, রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ি এল। সঙ্গে তার বন্ধু রোমি। টুকুন পেশায় ডিজাইনার, একটি সংস্থায় চাকরি করে। সকাল ন'টা পনেরোর মধ্যে বেরিয়ে যায় রোজই। তবে ফেরার কোনও নির্দিষ্ট সময় থাকে না। কারণ, টুকুনের জীবনে টুকুনের বন্ধুরা খুবই বড় ভূমিকা নিয়ে আছে। টুকুনের বন্ধুরা মাঝে মাঝেই কোনও বিশেষ একজন বন্ধুর বাড়িতে জড়ো হয়ে সারারাত গল্পগুজব করে। মাঝে-মাঝে কোনও ক্যাফেতেও তারা সমবেত হয়। তা ছাড়া তাদের মধ্যে অনেকে গান গায়। কেউ-কেউ থিয়েটার করে, যারা গান নিয়ে আছে তাদের কেউ নিজেরাই গান লেখে, আর-একজন সুর দেয়, অন্য কেউ গানটি গায়। কখনও-কখনও দু'জন একসঙ্গেও গান করে। তারপর বোলপুর বা অন্য কোনও মনোরম স্থানে গিয়ে সেই গান নিয়ে ভিডিয়ো-চিত্র তোলে। কখনও কলকাতার ভিতরেই সুন্দর দেখে একটি বড় বাড়ি নির্বাচন করে নেয়। ইনডোরেই ছবি ওঠে তখন। একটি কিশোরী বা তরুণী নীরব অভিনয় করে। যারা গান গায় তাদের গলা নেপথ্য থেকে ভেসে আসে। দু'-একবার গায়ক-গায়িকাদের দেখা যায়। তারপর গানের সেই ভিডিয়ো ইউটিউবে তুলে দেওয়া হয়। সেই ভিডিয়ো যেদিন মুক্তি পায় সেদিন রাত আটটা নাগাদ বন্ধুরা কোনও কফিশপে একত্রিত হয়। তারপর ভিডিয়োর মুক্তি উপলক্ষে কোনও বন্ধুর বাড়ি সারারাত গানবাজনা আর আড্ডা হয়। টুকুনের জীবনযাপন এইরকম।

আজকে টুকুনের বাড়ি ফিরতে এগারোটা বাজল কারণ আজকেও একটি কফি শপে একজনের ভিডিয়ো রিলিজ় ছিল। মেঘের মতো কালো মুখ নিয়ে টুকুন বাড়ি ঢুকল। অখিলেশ খুবই কুণ্ঠিত গলায় মেয়েকে বললেন, "মা বিনীতার বাড়ি চলে গিয়েছে আমার উপর রাগ করে। চল আমরা দু'জনে মাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিস না।"

এইসময় দরজায় বেল বাজল। দরজা খুলল টুকুনই। ড্রাইভারের হাত থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে তাকে বলল, "এখন বাড়ি যা। সকাল ন'টার মধ্যে চলে আসিস। আমার অফিস, মনে আছে তো?"

অখিলেশ দেখলেন আজকে সুরমাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার শেষ আশাটিও ধ্বংস হয়ে গেল। তবু দুর্বল স্বরে একবার বললেন অখিলেশ, "ড্রাইভারকে কি ডেকে আনব গিয়ে? ও এখনও হয়তো বেশিদূর যায়নি।"

টুকুনের স্বর তীক্ষ্ণ, "কেন? ফোন ডেকে আনবে?"

টুকুন উত্তরের অপেক্ষা না করে ওর মায়ের ঘরে ঢুকে গেল। পোশাক পরিবর্তন করবে। প্রতিদিনই টুকুন বাড়ি ফিরে একবার ওর মায়ের ঘরে ঢোকে। বাইরের জামাকাপড় বদল করে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আবার, ঘরোয়া পোশাক পরে।

এখন ঘরের ভিতর থেকে টুকুনের গলা শোনা যায়, "মা কেন চলে গেল হঠাৎ? চলে যাওয়ার আগে মাকে কী বলেছিলে তুমি?" ওর স্বর আগের মতোই ধারালো।

অখিলেশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তাঁর মাথা কাজ করছে না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, একেবারে মূর্খের মতোই অখিলেশ বললেন, "আমি বলেছিলাম তুমি যেয়ো না। আমার ওপর রাগ করে তুমি চলে যেয়ো না। আমার কথাটা একবার শোনো।" সত্যি-সত্যি এই কথাগুলিই বলেছিলেন অখিলেশ। যখন অখিলেশ বুঝলেন দুটো ব্যাগে জামাকাপড় গুছিয়ে নিচ্ছেন সুরমা, বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, তখন তিনি সত্যিই এই কথাগুলো বলেছিলেন সুরমাকে। সুরমা তাঁর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ড্রাইভারকে ফোন করে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে চলে যান।

অখিলেশ দেখলেন টুকুন বাথরুমের দরজা খোলা রেখে বেসিনের কল খুলে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। অখিলেশ বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের স্বরে বললেন, "বিশ্বাস করো বাবা, যাওয়ার আগে তোমার মাকে কেবল আমি এইটুকুই বলেছিলাম।"

অখিলেশ টুকুনের ফোন এলে রিসিভ করে বলেন, "হ্যাঁ, বাবা। বলো।" তিনি মেয়েকে 'মা' না ডেকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করেন। তার একটা গূঢ় কারণ থাকতে পারে। টুকুন অখিলেশকে 'বাবা' বলে ডাকে না। টুকুন যখন খুব ছোট তখন বাড়িতে যারা আসত তারা অখিলেশকে 'অখিলদা অখিলদা' বলে ডাকত। লেখকের বাড়ি, লোকজনের নিত্য যাতায়াত লেগেই থাকত। ছোট্ট মেয়ে, সেই শুনে-শুনে, অখিলেশকে 'অকিদাই' বলে ডাকতে শিখল। কচি গলায় ওই 'অকিদাই' ডাকটি ভারী মিষ্টি শোনায়। অখিলেশ সুরমাকে বলেছিলেন, "যা বলে ওর ডাকতে ইচ্ছে করে ডাকুক না।"

এখানে অখিলেশের জীবনের একটি ইতিহাস জানিয়ে রাখা দরকার। আগে সুরমার একটি বিবাহ হয়েছিল। সেই বিবাহ থেকে সুরমা বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেন, এই মেয়ে টুকুনকে সঙ্গে নিয়ে। সুরমার দ্বিতীয় স্বামী অখিলেশ। তিনি সুরমার হাত থেকেই টুকুনকে লাভ করেন। সুরমাও প্রথমে অখিলেশকে অখিলদা-ই বলতেন। তখন টুকুনের বয়স আড়াই বছর। সুরমা এবং অখিলেশ রেজিষ্টি বিবাহের আগে দু'বছরের অধিক সময় একত্রে বসবাস করেছিলেন টুকুনকে সঙ্গে নিয়েই। সেই সময়েও সুরমা অখিলেশকে অখিলদা-ই বলতেন। সব মিলিয়ে শিশু টুকুনের মুখে, 'অকিদাই' ডাকটিই এসে যায়। তাঁদের নিজেদের কোনও সন্তানাদি হয়নি। কে জানে, "বাবা" ডাক শোনার জন্য সুপ্ত বাসনা অতৃপ্ত থেকে যাওয়ার ফলেই হয়তো টুকুনকে 'মা' না বলে 'বাবা' সম্বোধন করে আসছেন অখিলেশ।

যদিও এই মুহূর্তে অখিলেশ জানেন যে, তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন বা ধরা দিতে বাধ্য হয়েছেন। এখনও, তবু, অন্তত টুকুনের সামনে, কোনও এক চক্ষুলজ্জায় পড়ে, অখিলেশ আসল কারণটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন। কেন যে এই বোকামি করছেন, অখিলেশ নিজেও ভাল করে জানেন না।

টুকুন বাথরুমের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিল— যেন অখিলেশের মুখের উপরেই— নয়তো অত জোরে বন্ধ করার দরকার ছিল না।

অখিলেশ বাথরুমের সামনে থেকে বসার ঘরের সোফার দিকে সরে আসতে-আসতে আপন মনে যেন নিজেকেই স্তোকবাক্য শোনান আর-একবার, "আমি তো এইটুকুই বলেছিলাম।"

বসার ঘরের সোফার ওপর নিজের পিঠের ব্যাগ নামিয়ে তার ভিতর কিছু খোঁজাখুঁজি করছিল টুকুনের বন্ধু রোমি। রোমি আজ রাতে এখানেই থাকবে, টুকুনের সঙ্গে। রাত এগারোটার পর রোমি টুকুনের সঙ্গে এবাড়িতে এসেছে মানেই রাতে থেকে যাবে। টুকুনও রোমির বাড়িতে গিয়ে মাঝেমাঝে থাকে।

হঠাৎ রোমি ব্যাগ হাতড়ানো বন্ধ করে মুখ তুলে অখিলেশের দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি কি শিশুর চাচা, কাকিমাকে আপনি এ ছাড়া অন্য কিছু বলেননি? আপনি শিশুর? কাকু?" তীব্র স্বরে প্রশ্নটি এল।

এতক্ষণে অপমানবোধ শব্দটির আর-এক প্রকার অর্থ বুঝতে পারলেন অখিলেশ। উকিলকে দিয়ে মেসেজ পাঠানো একরকম

অপমান। একুশটি ফোনকল এবং উনিশটি মেসেজের উত্তর না দেওয়া এককরম অপমান। 'আপনি শিওর আর কিছু বলেননি?' এই প্রশ্নটির মধ্যে রয়েছে আরও এককরম অপমান। সুরমা আঘাত পেয়েছেন এবং কঠোর কথা বলেছেন, তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিয়েছে টুকুন। ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছে অখিলেশের কথা পুরো উপেক্ষা করে— ঠিক কথা, সবই ঠিক। কিন্তু সুরমা আর টুকুন ঘরের লোক। আর ও? ও চরম আঘাত করলেও ও তো কখনও বাইরের লোক ছিল না অখিলেশের কাছে। রোমির এই উদ্ধত প্রশ্নে বাইরের আঘাত এবার বাজল অখিলেশের মনে। অখিলেশ কোনও উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। টুকুন যত রাত্তিরেই বাড়ি আসুক, এসে এককাপ চা খায়। টুকুন আর রোমির জন্য দু'কাপ চা তৈরিতে ব্যস্ত হলেন অখিলেশ। অখিলেশ এই মানসিক দুর্বিপাক সঙ্গে নিয়ে সবসময় যাবতীয় বাইরের কাজকর্ম করে চলেছেন। সুরমা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দিন দশেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। অখিলেশ রোজই অফিসে যান, মিটিং থাকলে মিটিংয়ে উপস্থিত হন। যে-সাঁইত্রিশটি কবিতা ও চলে যাওয়ার দিন কণি করে দিয়েছিল, সেই কবিতাগুচ্ছটি ওরই হস্তাক্ষর সমেত একটি পাক্ষিক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কেবল প্রত্যহ সন্ধের পরে, সারাদিনের কাজ মিটিয়ে রাত সাড়ে আটটা বা ন'টার সময় একবার ওই লেখিকার বাড়ি যান। সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে অখিলেশের সঙ্গে দেখা করতে আসেন না। বাইরের ঘরে চুপ করে বসে থাকেন অখিলেশ। তারপর এক পা এক পা করে সাহসে ভর দিয়ে সুরমা যে-ঘরে থাকছেন এখন, সেই ঘরে গিয়ে মুখ বাড়ান। অনুনয়-বিনয় করেন ফিরে যাওয়ার জন্য। তারপর আবার মন্থর পায়ে সেই কক্ষ ত্যাগ করে বাইরের ঘর পেরিয়ে চলে আসেন। লেখিকা তাঁকে প্রতিদিনই একবার জিজ্ঞাসা করেন চা খাবেন কি না। কিন্তু অখিলেশের চা খেতে ইচ্ছে করে না। কোনও কোনওদিন লেখিকা বাড়ি থাকেন না। সেদিন সুরমাই দরজা খোলেন, বলেন, "আবার এসেছ? বলেছি তো যাব না।"

অখিলেশ বলেন, "তোমার কি কিছু দরকার? বাড়ি থেকে এনে দেব?"

উত্তর আসে, "ওসব নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। টুকুনকে আমি ফোনে সব বলে দিয়েছি।"

অখিলেশ সেসব দিনে বাইরের ঘরে একা চুপ করে বসে থাকেন। কোনও দিন আধঘণ্টা, কখনও একঘণ্টা। যতক্ষণ বসে থাকেন অখিলেশ, ততক্ষণই তাঁর মাথা বসা অবস্থায় সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে। শেষপর্যন্ত অখিলেশের কপাল তাঁর হাঁটুতে ঠেকে যায়।

ইদানীং অফিসের টেবিলে বসে থাকলেও অখিলেশের মাথা ঝুঁকে ঝুঁকে সামনে চলে আসে। হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছতে চায়। পারে না। তার আগেই সামনে রাখা অফিসের টেবিলে মাথাটা ঠুকে যায় অখিলেশের। অথচ তাঁর চোখে ঘুম নেই। ঘুমের ঝোঁকে ঢুলে পড়া নয় এটা। সচেতনভাবে ভেবে দেখেছেন তিনি, বসে থাকা অবস্থায় তাঁর নিজেরই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে ইচ্ছে করে। মাথাটা হাঁটুতে ঠেকে গেলে ওরকম ঠেকিয়ে রাখতে ইচ্ছা হয়। যেন একটু আরাম লাগে। ঝুঁকে, মাথাটা হাঁটুতে ঠেকিয়ে যতক্ষণ পারেন বসে থাকেন অখিলেশ। বাড়িতে এটা থাকার সময় এইভাবে বসার সুযোগ পান তিনি। টুকুন বাড়ি ফিরলে ধমক দেয়, "ওইভাবে কুঁকড়ে বসে আছ আবার? একুনি সোজা হয়ে বসো।"

দিনে রাতে প্রধানত তিন-চারবার ওর স্মৃতি প্রবলভাবে ফিরে ফিরে আসতে থাকে। অতিমাত্রায় ওষুধ খেয়ে ভোরের দিকে ঘুমের আচ্ছন্নতাটুকু আসে, বড় জোর সকাল ছ'টা পর্যন্ত স্থায়ী হয় সেই স্বল্পকালীন তন্দ্রাঘোর। কখন ভোরের প্রথম পাখিটি ডেকে উঠবে আর অখিলেশ শুনতে পেয়ে যাবেন, এই ভয়ে তিনি একটা কান বালিশে ঢেকে পাশ ফিরে শুয়ে অন্য কানে নিজের হাতের একটি আঙুল দিয়ে ঘুমোনোর চেষ্টা করেন। ভোর ছ'টার ভিতর ঘুমটুকু ভাঙলেই যে-কথাটি অখিলেশের মনে পড়ে তা হল, ও আর অখিলেশের জীবনে নেই। ও আর কখনও আসবে না। সকাল ছ'টায় তাঁর দিন শুরু হয় ও অখিলেশকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এই কথা মনে করার মধ্যে দিয়ে। তক্ষুনি বহু স্মৃতি মনে আসা শুরু হয়ে যায়। উকিলকে দিয়ে মেসেজ করানো পর্যন্ত সব কথা হু-হু করে ছুটে আসে মনে। দ্বিতীয়বার অখিলেশ সংকটে পড়েন স্নান করতে গিয়ে। তার আগে ন'টা থেকে সোয়া ন'টার মধ্যে টুকুন অফিস বেরিয়ে যায়। সাড়ে আটটা থেকে বেরোবার জন্য তৈরি হতে শুরু করে টুকুন। ছ'টার সময় ঘুম থেকে উঠে অখিলেশ নিজের জন্য চা তৈরি করেন। চায়ের জল বসিয়ে অখিলেশ বাথরুমে ঢোকেন।

ব্রাশ করার পর মুখে জোরে জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ তুলতেই বেসিনের ঠিক উপরে টাঙানো আয়নার মুখোমুখি হয়ে যান তিনি। এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিত ও। নিজের মুখের দিকে একদম তাকাতে ইচ্ছে করে না অখিলেশের এখন। এই সেই মুখ, তিনি আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবেন। এই মুখ কত-কত দিন নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকেছে ওর মুখের দিকে। এই মুখের দিকে ও-ও তাকিয়েছে কত-কত দিন। এই মুখ যদি অ্যাসিডে জ্বালিয়ে দেওয়া যেত। নিজের মুখকে যদি অখিলেশ নিজেই আর চিনতে না পারতেন।

যথাসম্ভব দ্রুত আয়নার সামনে থেকে সরে গিয়ে বাথরুমে রাখা টাওয়েল টেনে নেন অখিলেশ। জলসিক্ত মুখটি মোছার সময় বুঝতে পারেন আবার তার মধ্যে থেকে উচ্ছ্বসিত হতে চাইছে কান্নার বেগ। ওর জন্য কান্না।

অখিলেশ বাথরুম থেকে বেরিয়ে চা তৈরি করে খাওয়ার টেবিলে এসে বসেন। এই টেবিলে বসে কতদিন সুরমার সঙ্গে দুপুরের খাবার খেয়েছে ও। ও আর কোনওদিনই এই টেবিলে এসে খেতে বসবে না। সকালবেলার নরম আলো গাছের পাতায় এসে পড়েছে, পাশের বাড়ির পাঁচিলে পড়েছে। পাখিরা এখনও ডাকছে। একা-একা চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার সময় অখিলেশের মনে হয়, অখিলেশ রোজ সকালে সুরমার সঙ্গে এই টেবিলে বসে চা খান। এখন সুরমার অভাবটুকু অখিলেশ বোধ করেন, প্রত্যেক সকালে চা খেতে বসে। সুরমার অনুপস্থিতি বাড়িয়ায় খাঁ খাঁ করে রোজ। হকার বেল বাজিয়ে সংবাদপত্রগুলি দিতে আসে। দরজা খুলে সংবাদপত্রগুলি নিয়ে নেন অখিলেশ। একটি কাগজও খুলে দ্যাখেন না। ঘুমন্ত টুকুনের পাশে রেখে আসেন। সকালে উঠেই বড় কাপের এক কাপ কফি খায় টুকুন। তখন দু'-এক ঝলক হেডলাইনগুলি দেখে নেয়। অখিলেশ ভাবেন, অখিলেশকে ছাড়াই, সুরমা, ওই লেখিকার সঙ্গে চা খেতে বসেছেন নিশ্চয়। আর ও? ও এখন, এই সকালে কী করছে, সেকথা কিছুতেই মনে আনতে চান না অখিলেশ। মন থেকে জোর করে সরাতে চান অখিলেশ। সক্ষম হন না। এই সময় কাজের বউটি এসে পড়ে।

টুকুনও ঘুম থেকে উঠে ত্রাশ করতে বাথরুমে ঢুকে যায়। কাজের বউটি এখন প্রথমেই প্রশ্ন করে, "বউদি আসেনি?"

"না," শব্দটি উচ্চারণ করে টেবিলে চুপ করে বসে থাকেন অখিলেশ। আবারও তাঁর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়। অখিলেশ সেই প্রবণতা সরিয়ে দেবার জন্য কাজের বউটিকে বলেন, "টুকুনকে যখন কফি দেবে আমাকে আর-এক কাপ চা দিয়ো।"

টুকুন বাথরুম থেকে বেরিয়ে টেবিলের কাছে আসতে আসতেই কাজের বউটি টুকুনের হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দেয়। টুকুনের হাতে কফির কাপ দেখা মাত্র অখিলেশের মন পড়ে, ও-ও সকালে এক কাপ কফি খায়। টুকুনের সালোয়ার কামিজ কাচার পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বারান্দায় টাঙানো নাইলন দড়িতে। দেখামাত্র অখিলেশের মনে পড়ে ওর ফ্ল্যাটে যখন অখিলেশ-সুরমা যেতেন, প্রায়ই যেতেন, তখন ওর ফ্ল্যাটেও নাইলন দড়িতে ঝোলানো থাকত সালোয়ার কামিজ। প্রধানত সালোয়ার কামিজই পরত ও। টুকুনও সালোয়ার কামিজই পরে।

কিছুতেই মনকে ওর চিন্তা ওর অনুষঙ্গ থেকে সরিয়ে রাখতে পারছেন না অখিলেশ।

টুকুন যখন কফি খেতে খেতে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে হেডলাইনে চোখ বোলাচ্ছে, অখিলেশ ভয়ে ভয়ে বললেন, "আজকে কখন বেরোবে, বাবা?"

কাগজ থেকে চোখ সরাল না টুকুন। কোনও উত্তরও দিল না। কাজের বউটি টুকুনকে জিজ্ঞাসা করল, "কী খাবে দিদি?"

টুকুন বলল, "ফল কেটে দাও।"

একবার কথা বলেছে, গলা তো স্বাভাবিক লাগল, অখিলেশ আশ্বাস ভর করে নম্রভাবে বললেন, "কখন বেরোবে তুমি?"

উত্তর এল, "জানেই তো কখন বেরোই রোজ। বারবার এক কথা বলছ। বলবার জন্য কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি? ডিসগাসটিং!"

কঠোর উত্তরটি পেয়ে আবার চুপ করে বসে রইলেন অখিলেশ। এর মধ্যে একদিন খুব কাটা কাটা ইংরেজিতে টুকুন অখিলেশকে স্পষ্ট করে জানিয়েছে তার মনোভাব, "তুমি মাকে টিট করেছ, আমাকেও টিট করেছ, তুমি একজন ট্রেটর।"

টুকুন যে-সময়টুকু বাড়িতে থাকে, অখিলেশের সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না। মাকে কোন করে। মায়েরও ফোন আসে টুকুনের কাছে, কখনও বা লেখিকার ফোন আসে।

সেসব ফোন এলেই যথাসম্ভব দূরে সরে থাকার চেষ্টা করেন অখিলেশ। যেন ফোনালাপের কোনও কিছুই অখিলেশের কানে না যায়। তবুও দু'-একটা কঠিন কঠোর টুকরো ছিটকে এসে বিঁধে যায় অখিলেশের মনে। কথা যতটুকু হয় অখিলেশকে নিয়েই হয়। লেখিকা বিবাহবিচ্ছিন্ন, একটি সাবালক পুত্রকে নিয়ে তার সংসার। অখিলেশ যখন প্রত্যেকদিন সুরমার সঙ্গে দেখা করতে যান, কোনও কোনও দিন লেখিকার পুত্রটি বাড়িতে থাকে। সে খুবই সদয় ব্যবহার করে অখিলেশের সঙ্গে। দু'-চারটি কথার বিনিময়, তার বেশি নয় হয়তো—তবু অখিলেশের মনে হয়, এই তরুণটি কি জানে কোন কারণে সুরমা এসে রয়েছেন তাদের বাড়িতে? এই সদ্য তারুণ্যপ্রাপ্ত ছেলেটির কী মনে হবে যদি সে জানতে পারে যাট উত্তীর্ণ অখিলেশ একটি তরুণীর সঙ্গে প্রেম-সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন? এই কুড়ি একুশ বছরের তরুণটিও কি তাঁকে লম্পট দুশ্চরিত্র বলবে? বলবে টেট্রর?

টুকুন অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর স্নান করতে যান অখিলেশ। স্নানঘরে তিনি পুরোপুরি একা। ওর সঙ্গে যাপন করা সব মুহূর্তের ছবি একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে অখিলেশের মনে। ওর একটা তাকিয়ে থাকা, ওর একটুকরো হাসি, ওর বলা তুচ্ছ কোনও কথা—জ্বলজ্বল করে ওঠে অখিলেশের মন ওই স্নানঘরের নির্জনতায়। পাগলের মতো মাথায় মগের পর মগ জল ঢালতে থাকেন অখিলেশ, যাতে জলের ধারায় ওই ছবিগুলো ধুয়ে যায়।

যায় না। টাওয়েলে গা-মাথা মোছার সময় ওই ছবিগুলি আবার আক্রমণ করে। ও যখন গান নিয়ে বলত, ওর চোখমুখ, ওর ভাষা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যেত। মনে ভেসে ওঠে সমস্ত ছবিই। সমস্ত টুকরো ভঙ্গিমা। তাকানো, হাসি, চোখ তোলা, চোখ নামিয়ে নেওয়া গীতবিতানের পৃষ্ঠায়। আবার চোখ তোলা। কিছুতেই যেন এই স্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার পান না অখিলেশ। মরিয়া হয়ে অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়েন।

দিনের মধ্যে তৃতীয়বার পুরোপুরি একা হয়ে পড়েন অখিলেশ, রাত্রে শুতে যাওয়ার সময়। শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করার পর থেকেই অখিলেশের প্রবল ভয় করতে থাকে। এই সময় কানে যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসে ফোনের কণ্ঠস্বর, "আমার ওপর কি রাগ করেছেন?" মনে ভেসে আসে সেই মেসেজ, "LOVE U।"

এবং তার কিছুক্ষণ পরের সেই ফোনটি, "আমার মেসেজ পেয়েছেন?"

অখিলেশ এখনও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যেন ও সত্যি সত্যি তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তিনি কী অন্যায় করেছিলেন, কী কী ছিল অখিলেশের দোষ— সে কথা জানতে চেয়ে আটবার-ন'বার মেসেজ করেছিলেন অখিলেশ। কোনও উত্তর আসেনি।

রাত্রির নির্জন প্রহরে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে থাকেন, অখিলেশ রয়, তাঁর জাগ্রত শব। যে-শব চিন্তা করতে পারে। অখিলেশ উপলব্ধি করেন, তিনি ফুরিয়ে গিয়েছিলেন ওর কাছে। তিনি কখনও বোঝেননি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ওর মন আর কিছুই পাচ্ছিল না।

এখন একদিকে ওর ছেড়ে যাওয়ার মর্মান্তিক কষ্ট, অন্যদিকে সুরমার গৃহত্যাগ, টুকুনের ঠান্ডা কঠোরতা— সব মিলেমিশে অখিলেশকে একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত করেছে।

অখিলেশ বুঝতে পারেন, একেবারে অখিলেশের মতো সুরমাও একটি বড় আঘাত পেয়েছেন। সুরমার আঘাতটি এসেছে অখিলেশের দিক থেকে। কিন্তু তিনি সুরমাকে আজও ভালবাসেন। তবু অখিলেশ ওর কাছে একরকম আনন্দ আর শান্তি পেয়েছিলেন। এই বয়সেও অখিলেশের প্রতি কোনও নারী মুগ্ধ হতে পারে, এমন ধারণাই ছিল না তাঁর।

ওর উপস্থিতি আর ওর ব্যবহারে সেই ধারণা জন্মেছিল। অখিলেশ নিজের মনে চিন্তা করেন, গানে এক-একটি রাগ তো এক-এক রকম। অখিলেশের মন বলে, রাতের রাগ মিঞা কি মল্লার, রাতের রাগ বাগেশ্রী, দরবারি কানাড়া। ওদিকে দুপুরের রাগ শুদ্ধ সারং। সকালের রাগ রামকেলি, টোড়ি, আশাবরী। বেলা পড়ে আসার রাগ পূর্বী, পুরিয়া, মারোয়া। সন্ধ্যার রাগ ইমন, শ্যাম কল্যাণ।

এক-এক সময়ের, এক-একরকম রাগের কাছে আমরা এক-একরকম আলো পাই। রস পাই। আনন্দ পাই। বিষাদ পাই। এক-একটা মানুষের কাছেও তো এক এক রকম আলো পেতে পারি আমরা। ওর কাছে যে-আলো পেয়েছিলেন অখিলেশ, সেই আলো কেবল ও-ই দিতে পেরেছিল তাঁকে। অখিলেশ জীবনে কয়েকবারই এই জিনিস অনুভব করেছেন, এক-একটি রাগের কাছে এক-একটি আলো পাওয়ার মতো মানুষের স্বভাবেরও প্রকারভেদ আছে। কেবল মাত্র একজন মানুষ কাউকে সব কিছু দিতে পারে না। মনের যে-তেষ্টা তারও নানারকম প্রকার আছে। এক-একরকম মানুষের কাছে গিয়ে এক-একরকম তেষ্টা মেটে আমাদের। অখিলেশ তো জীবনে কখনও সুরমা টুকুনকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবেননি। ও-ও কখনও কোনও কথায় অখিলেশকে নিয়ে সংসার করার ইঙ্গিত দেয়নি। অখিলেশ আর ওর মধ্যে এই সম্পর্কের যাত্রা কখন কীভাবে একসময় শুরু হয়ে গিয়েছিল সেকথা যেন তিনি নিজেও জানেন না। তিনি ভেসে গিয়েছিলেন, তারপরের কথা আর ভাবেননি। ও কি ভেবেছিল? ওর বিষয়ে কিছুই আর এখন বুঝতে পারেন না অখিলেশ। এভাবে, মাত্র একটি বাক্য ব্যয় করে ও যে তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারে অখিলেশ কল্পনাও করতে পারেননি।

রাত্রির পর রাত্রি জেগে থাকতে থাকতে আর পরিমাপহীন ঘুমের ওষুধ খেতে খেতে একরাতে অখিলেশ আবিষ্কার করলেন, তিনি একটা নতুন জিনিস ভেবে চলেছেন। কী ভাবছেন অখিলেশ?

তিনি ভাবছেন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি যে-রিকশা স্ট্যান্ড আছে সেখানে গিয়ে একটি সাইকেল রিকশায় উঠবেন। রিকশা তাঁকে পৌঁছে দেবে নিকটবর্তী অটো স্ট্যান্ডে। সেখানে অটোয় উঠে তিনি চলে যাবেন মেট্রোরেলের স্টেশনে। মেট্রোর সিঁড়ি দিয়ে উঠে টিকিটের লাইনে দাঁড়াবেন। একটি টিকিট কিনবেন। কিনে আবারও সিঁড়ি দিয়ে নেমে মেট্রোর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছবেন। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করবেন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন প্রবেশ করার একদম মুখে। যেই ট্রেন ঢুকবে, ঝাঁপ দেবেন।

এইটাই একমাত্র মুক্তির উপায়। ও ছেড়ে চলে যাওয়ার কষ্ট এবং সংসারের মধ্যে থেকে প্রত্যেকদিন কঠোর বাক্য শোনা ও রূঢ় ব্যবহার পাওয়া— এভাবে অপরাধী হয়ে বেঁচে থাকার দুঃসহ যাতনা থেকে বাঁচবার একমাত্র রাস্তা মেট্রোরেল। একাগ্র মনে রাত্রিবেলা এই পথটির কথাই ভাবতে শুরু করলেন অখিলেশ। কেবল রাতে নয়, দিনের বেলাতেও অখিলেশের মনে এই চিন্তা হানা দিতে শুরু করল। টুকুন বেরিয়ে গেছে, টুকুনের কামিজ কেচে শুকোতে দেওয়া হয়েছে— এই দৃশ্য চোখে পড়া মাত্র অখিলেশের মনে ওর স্মৃতি ফিরে এল। কীরকম রংয়ের সালোয়ার কামিজ পরত ও, কীভাবে ওড়না ঠিক করত হাত কাঁধের দিকে উঁচু করে তুলে, আর সেইসঙ্গে কীভাবে জ্বলজ্বলে

সন্ধেবেলা একটা ব্যাগে কিছু জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে ডেকে সুরমা বেরিয়ে গেলেন।

আঁখিতারা নিয়ে তাকিয়ে থাকত অখিলেশের দিকে, চলচ্চিত্রের এক-একটি জীবন্ত দৃশ্যের মতো সবই ফুটে উঠতে লাগল অখিলেশের চোখের সামনে।

যুদ্ধ করতে-করতে অখিলেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সারাক্ষণ অখিলেশের মনের মধ্যে কে যেন বলে চলল, 'মেট্রোরেল, মেট্রোরেল।' অখিলেশ একদিন দেখলেন, তিনি অটোর লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অখিলেশের চমক ভাঙল। অখিলেশ বাড়িতে জামাকাপড় বদলেছেন। জুতো পরেছেন। কাজের বউটিকে বলেছেন দরজা বন্ধ করে দিতে, কারণ অখিলেশ একটু বেরোচ্ছেন। অখিলেশ বেরিয়ে সাইকেল রিকশা নিয়েছেন, অটো স্ট্যান্ডে নেমে রিকশার ভাড়া মিটিয়েছেন, তারও পর অটোর লাইনে দাঁড়িয়েছেন। একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন— লাইন এগিয়ে গেছে, স্থির দাঁড়িয়ে অখিলেশ। তখন পিছনের লোক অখিলেশকে পিঠে খোঁচা দিয়ে বলেছে, "দাদা, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? লাইন তো এগিয়ে গেছে, সামনে চলুন"— তখন অখিলেশের চেতনা ফিরেছে।

অখিলেশ চুপচাপ লাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য দু'-চারজন একটু বিস্মিত চোখে অখিলেশকে দেখল। কারণ, এতক্ষণ লাইন দেওয়ার পর হঠাৎ একটি লোক বেরিয়ে যাচ্ছে কেন, এটা স্বাভাবিক কৌতূহলের বিষয়। তখন অখিলেশের বোধগম্য হচ্ছে যে, নিশ্চয়ই অখিলেশের চোখে-মুখে খুবই অন্যমনস্কতা বা অন্যকিছু ফুটে উঠেছিল, যা স্বাভাবিক নয়। তাঁর চেতনায় ফেরত আসাটাও বুঝি অন্য যাত্রীদের চোখে ধরা পড়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে-ফিরতে অখিলেশ স্পষ্ট বুঝলেন তিনি কোথায় পা বাড়াচ্ছিলেন। এবারও তিনি একটি রিকশায় চলেছেন। নিজের চিন্তাশক্তি এবং কাজকর্মের উপর অখিলেশের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না, অন্তত আধঘণ্টা।

অখিলেশের একথাও মনে হল, এমন অসময়ে হঠাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলে সুরমা নিশ্চয়ই বলতেন, "এ কী? এখন কোথায় যাচ্ছ?" আর তখনই অখিলেশের ঘোর ভেঙে যেত। সুরমা নিশ্চয়ই বলতেন যদি সুরমা উপস্থিত থাকতেন।

বাড়ি ফিরে এলেন অখিলেশ। কতটা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে তাঁর মন, আজ সে-কথা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করলেন তিনি।

ষোলো

নিজের অজান্তেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে অটো স্ট্যান্ড পর্যন্ত চলে গিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ার পর নিজের সম্পর্কে সতর্ক হলেন অখিলেশ। এ তিনি কী করতে যাচ্ছিলেন? এ কথা সত্য যে, নিজের অস্তিত্বকে তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। আত্মগ্লানি এবং অপমানিত হওয়ার যন্ত্রণা অখিলেশকে ছারখার করে দিচ্ছে দিবারাত্র। এই যন্ত্রণাকে প্রেম হারানোর যন্ত্রণা বলে মনে করেছিলেন অখিলেশ। এখন মনে হচ্ছে কারও প্রতি যদি সত্যি প্রেম থাকত, তিনি এতটা তলিয়ে যেতেন না। অখিলেশ সবকিছুর জন্য নিজেকেই দায়ী করছেন। এই বয়সে ওর সঙ্গে এত গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ার সময় যে-সম্মোহনের টানে ছুটে গিয়েছিলেন অখিলেশ, সেই সম্মোহনকে ঠিক সময়ে চিহ্নিত করতে পারলে এতখানি নিমজ্জিত হয়ে, এতখানি সর্বস্ব হারানোর অনুভব আসত না। অখিলেশের মনে হয় এখন সুরমা ও টুকুন তাঁর সঙ্গে যে -কঠোর এবং তিক্ত ব্যবহার করে চলেছে, সেটা ঠিকই করছে। এমন ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যই তিনি। সেইজন্যই অখিলেশের নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা বারবার মনে হচ্ছে।

অখিলেশ বাড়ি এসে বাইরের ঘরের সোফায় বসে রইলেন। বসবার কিছুক্ষণ পরেই ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়তে লাগলেন। চেয়ারে বা সোফায় বসে থাকা অবস্থায় অখিলেশের মাথা ঝুঁকে গিয়ে হাঁটু স্পর্শ করে থাকলে অখিলেশের যেন কিছুটা শান্তি আসে। মনের ভিতরে সর্বক্ষণ যে -জ্বালাপোড়া চলছে, সেই দহন যেন কিছুটা বিরাম পায়।

দরজায় বেল বাজল। বেল বাজলে এখনও অখিলেশের বুক ধড়াস করে ওঠে। ও এসে দরজায় বেল বাজাত। এখন যে-ই আসুক, চিঠি দিতে কুরিয়র সার্ভিসের লোক এলেও, যখনই বেল বাজে অখিলেশের হৃৎস্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। অখিলেশ খুব ভাল করে জানেন ও আর কখনও আসবে না। এ কথা জানা সত্ত্বেও, ও যে অজস্রবার এসেছে এ বাড়িতে, তখন অজস্রবার যে বেল বাজিয়েছে, দরজার বেলের সেই শব্দ অখিলেশের মস্তিষ্কে যেন গ্রথিত হয়ে গেছে। যতবার বেল বাজে, ততবার চমকে ওঠেন অখিলেশ, আর তার পরমুহূর্ত থেকে ওকে

হারানোর যন্ত্রণা নতুন করে আবার শুরু হয়। ঠিক ওকে হারানোর যন্ত্রণাও এখন বলা যায় না একে, এর সঙ্গে অন্য এক যন্ত্রণাও মিশে আছে। অখিলেশের পরিবারের যে-স্থিতাবস্থা, সেটা তো ভিতরে-ভিতরে চুরমার হয়ে গেছে— সেই ভাঙনের যন্ত্রণাও দরজায় এই বেল বাজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এখন। দুটো দু'রকম যন্ত্রণা। একটাই উৎস থেকে জাগ্রত হয়ে উঠছে।

দরজা খুললেন অখিলেশ। কাগজের হকার। পাক্ষিক পত্রিকাটি দিয়ে চলে গেল। সুরমা গল্প পড়তে খুব ভালবাসেন। যতরকম পত্রিকা প্রকাশ পায়, সবগুলিই সুরমা রাখেন। তা ছাড়া অখিলেশ একজন লেখক। সব কাগজই অখিলেশের দেখা উচিত। এই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে অখিলেশ দেখলেন, এখানে তাঁর কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে। ওর কপি করে দেওয়া সেই কবিতাগুচ্ছটি।

সঙ্গে-সঙ্গে পত্রিকা বন্ধ করে ফেললেন অখিলেশ। পত্রিকাটি নিয়ে পুরনো খবরের কাগজ যেখানে জড়ো করে রাখা আছে, সেখানে গুঁজে দিলেন। অখিলেশের নিজের চোখে যেন ওই কবিতাগুচ্ছ আর না পড়ে। ও যখন রোজ এগ্রমপার্টসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে, তখন ওর মন পাওয়ার জন্য, হাতে ওকে ধরে রাখবার জন্যই, অধীর হয়ে একের পর এক প্রেমের কবিতা লিখে চলেছিলেন অখিলেশ ওকে নিয়ে। ওই কবিতাগুচ্ছ তিনি আর দেখতে চান না। অখিলেশ ভাবেন, নিজের মতো মূর্খ তিনি আর কোনও মানুষকে দেখেননি।

কাজের বউটি ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড় কাচতে দিচ্ছে। ওয়াশিং মেশিন চলছে। ঘরে অখিলেশের কানে আসছে মেশিন চলার যান্ত্রিক শব্দ।

ও যখন গীতবিতান খুলে রবীন্দ্রনাথের গানে সুর এবং বাণীর সম্পর্ক নিয়ে একটানা কথা বলে যেত, তখনও ওই ওয়াশিং মেশিন চলার এই বিশেষ যান্ত্রিক শব্দটিই ভেসে আসত পশ্চিমের বারান্দা থেকে। আজকে, এখন, ওই যান্ত্রিক শব্দটি শুনে, গান নিয়ে ওর কথা বলা মনে পড়ছে অখিলেশের। ঠিক-ঠিক বলতে গেলে ওর কথা বলাও মনে পড়ছে না। ও যে এ ঘরে এসে বসত, সেইটা মনে পড়ছে। অথবা, ওর এ ঘরে এসে বসাও মনে পড়ছে না। ওকে মনে পড়ছে। না, ওকেও আর মনে পড়ছে না। কেবল সেই দুর্বোধ্য কষ্টটাই শুরু হয়ে যাচ্ছে। কষ্টটাই শুরু হয়ে গেছে সেকথাও বলা যায় না। কারণ ওই কষ্ট সমস্তক্ষণই আছে। বরং কষ্ট অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেতে শুরু করল ওয়াশিং মেশিনের ওই যান্ত্রিক আওয়াজ কানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে।

অখিলেশের আবার মনে হল, এই জীবন যতদিন থাকবে, এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবেন না অখিলেশ। চতুর্দিকে শুধু ওর স্মৃতি। দরজায় একটা বেল বাজলেও যন্ত্রণা। ওয়াশিং মেশিন চললেও যন্ত্রণা। রান্নাঘরে মাইক্রোআভেনে খাবার গরম করতে বসাতেন সুরমা যখন, অখিলেশের সঙ্গে বসবার ঘরে বসে কথা বলত ও। মাইক্রোআভেনের গোঁ-ও-ও শব্দ এসে পৌঁছত এই বসবার ঘরে। অখিলেশকে তখন হয়তো ও কোনও বই পড়ে শোনাচ্ছে। বসার ঘরে একটি সোফায় এখন বসে আছেন অখিলেশ। পাশেই রান্নাঘর। এবার কাজের বউটি মাইক্রোআভেন চালাল। অখিলেশকে খেতে দেবে। মাইক্রোআভেন থেকে নির্গত আওয়াজ অখিলেশকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওর কাছে। ও যেন এখনও এই ঘরেই বসে রয়েছে।

অখিলেশ ছটফট করে উঠলেন। স্থির হয়ে বসতে পারছেন না তিনি। তিনি কাজের বউটিকে বলতে পারেন না, তুমি ওয়াশিং মেশিন চালিয়ো না, মাইক্রোআভেন চালিয়ো না। দাঁতে দাঁত চেপে এই কষ্টসমূহ সহ্য করে যান অখিলেশ। আবার নতুন করে ভাবতে থাকেন, মেট্রোরেল, মেট্রোরেল। একবার পারিনি, কিন্তু পরের বার পারব। নিশ্চয়ই পারব। নিজেকে পুরো শেষ করে দিতে পারলে, এই চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী যন্ত্রণা থেকে চিরদিনের মতো নিস্তার পাওয়া যাবে।

ওয়াশিং মেশিন এখনও চলছে। মাইক্রোআভেন বন্ধ হল। কাজের বউটি ডাকল, "দাদাবাবু, খেতে দিচ্ছি আপনাকে।"

"যাই," বলে উঠে গিয়ে অখিলেশ বাথরুমে হাত ধুচ্ছেন, এই সময় ফোন বাজতে থাকল। ফোন বাজলে যে-আওয়াজটা হয়, তাতেও কষ্ট বেড়ে যায় অখিলেশের। ওরে ফোন এই আওয়াজ আর ওর কষ্টবর হিল পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো। ওর ফোন কখনও আসবে না, কিন্তু ফোন তো আসবেই।

ফোনের আওয়াজেও যন্ত্রণা। অখিলেশ সব ফোনই এখন মনের মধ্যে ওই যন্ত্রণা বহন করতে-করতেই ধরেন। ফোনের আওয়াজে যন্ত্রণা, দরজার বেল বাজলে যন্ত্রণা, ওয়াশিং মেশিন আর মাইক্রোআভেনের শব্দে কেবল ওর ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। পরিবার হয়ত্বখান হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা।

অখিলেশ ফোন ধরলেন। সেই লেখিকা ফোন করেছেন, যাঁর বাড়িতে এখন গিয়ে উঠেছেন সুরমা। লেখিকা বললেন, "আপনার কবিতাগুলো পড়লাম। সুরমাদিও পড়েছেন। সুরমাদি খুব আপসেট।"

অখিলেশ বলেন, "সুরমা তোমার সামনে আছে কি? ওকে কি একবার ফোন দেওয়া যাবে?"

লেখিকা বলেন, "সুরমাদি খাওয়ার পর এখন একটু শুয়েছেন। খাওয়ার আগে কবিতাগুলো পড়ে খুব কান্নাকাটি করেছেন। বলছিলেন, 'আমি কি এত পাপ করেছিলাম? আমার দুটো বিয়ের একটাও ভাল হল না! আমি তো ওদের অন্ধের মতো বিশ্বাস করতাম।'"

অখিলেশ বলেন, "আমাকে খেতে দিয়ে দিয়েছে। খেয়ে উঠে তোমাকে ফোন করব।"

লেখিকা বলেন, "আপনাকে আর ফোন করতে হবে না। সুরমাদির রিত্যাকশনটা আপনাকে জানানোর জন্যই ফোন করেছিলাম।"

লেখিকা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। অখিলেশও চুপ। ভাবছেন, এবার ফোন ওদিক থেকে রেখে দেওয়া হবে। হঠাৎ লেখিকা বলে ওঠেন, "ছি ছি! এটা আপনার কাছে আশা করা যায় না। আপনি কবিতাগুলো লিখলেন কী করে? আপনার একবারও সুরমাদির মুখটা মনে পড়ল না? আমার বর যদি এমন কবিতা লিখত, তাকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।"

অখিলেশ এতটা আশা করেননি। এই লেখিকা বয়সে অখিলেশের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট। তার মুখ থেকে 'বাড়ি থেকে বের করে দিতাম' কথাটা শুনে একটা তীব্র অপমানবোধ তৈরি হল অখিলেশের। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি নিজেকে মনে-মনে বললেন, 'এখনও তুমি নতুন করে অপমানিত বোধ করো? আপনার একবারও সুরমাদির মুখটা মনে পড়ল না? আমার বর যদি এমন কবিতা লিখত, তাকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।'

অখিলেশ এতটা আশা করেননি। এই লেখিকা বয়সে অখিলেশের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট। তার মুখ থেকে 'বাড়ি থেকে বের করে দিতাম' কথাটা শুনে একটা তীব্র অপমানবোধ তৈরি হল অখিলেশের। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি নিজেকে মনে-মনে বললেন, 'এখনও তুমি নতুন করে অপমানিত বোধ করো? আপনার একবারও সুরমাদির মুখটা মনে পড়ল না? আমার বর যদি এমন কবিতা লিখত, তাকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।'

অখিলেশ এতটা আশা করেননি। এই লেখিকা বয়সে অখিলেশের চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট। তার মুখ থেকে 'বাড়ি থেকে বের করে দিতাম' কথাটা শুনে একটা তীব্র অপমানবোধ তৈরি হল অখিলেশের। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি নিজেকে মনে-মনে বললেন, 'এখনও তুমি নতুন করে অপমানিত বোধ করো? আপনার একবারও সুরমাদির মুখটা মনে পড়ল না? আমার বর যদি এমন কবিতা লিখত, তাকে আমি বাড়ি থেকে বের করে দিতাম।"

লেখিকা কোন রেখে দিয়েছেন।

কান, মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করছে অখিলেশের। তবু অখিলেশ ভাবলেন, এ তো আমার প্রাপ্য। রোজ কত যন্ত্র করে রোলিশকে খেতে দিতেন সুরমা। এখন সুরমা অন্য বাড়িতে। এই জীবন আর টেনে নিয়ে চলার কোনও মানে হয় না। আজকে সকালে অখিলেশ পারেননি। তাতে কী? বিকেলে পারবেন। মেট্রোরেল তো সারাদিন ধরেই চলে। শুধু সাহস করে একবার ঝাঁপিয়ে পড়া। তারপর সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি।

খেতে-খেতে খাওয়া বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন অখিলেশ। সুরমা আর টুকুন তো কোনও দোষ করেনি। অখিলেশকে ছেড়ে চলে গেছে ও। অখিলেশের সঙ্গে ওর সম্পর্ক হয়েছিল। প্রেমের সম্পর্ক। সেই প্রেম ভেঙে গেছে বলে যদি আজ নিজেকে শেষ করে দেন অখিলেশ, তার পুরো শাস্তি তো গিয়ে পড়বে সুরমা আর টুকুনের উপর। অখিলেশ ব্যর্থ। হ্যাঁ। স্বামী হিসেবে ব্যর্থ। বাবা হিসেবে ব্যর্থ। প্রেমিক হিসেবেও ব্যর্থ। কে জানে কোন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে মাঝে-মাঝে মেসেজে অখিলেশকে 'LOVE U' লিখত ও। এখন ওর সেই খেয়াল ঘুরে গেছে অন্য কারও দিকে। কী স্বাভাবিকভাবে, যাকে বলে ক্যাজুয়াল, কত সহজ গলায় ও বলতে পেরেছিল, "ডোন্ট গেট হার্ট। আই অ্যাম ইন আ রিলেশনশিপ।"

কিন্তু এর জন্য যা কিছু শাস্তিভোগ, তা কেবল অখিলেশের নিজেরই

গ্রহণ করা উচিত। এখন যদি ওইভাবে অখিলেশের মৃত্যু হয়, অখিলেশের পরিবারের দু'জন নিরপরাধ মানুষ কী করে সমাজে মুখ দেখাবে তারা? অখিলেশ চাকরি করে প্রতিমাসে যে-টাকা আনেন পরিবারে, সংসার খরচের অনেকটাই সেই টাকা থেকে চলে। একলা টুকুনের উপর গিয়ে পড়বে তখন পুরো সংসারের ভার।

কাজের বউটি বলে, "দাদাবাবু খাচ্ছেন না কেন? খাওয়া বন্ধ করে বসে-বসে কী ভাবছেন? কুমড়োর তরকারি আর একটু দেব?"

খেয়ে উঠে অফিস যাওয়ার সময় গাড়িতে বসে অখিলেশ স্থির করেন এবার একজন মনোবিদের কাছে যেতেই হবে। একা-একা আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না অখিলেশ। এক্ষুনি কোনও অভিজ্ঞ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া দরকার। নইলে মেট্রোরেল-বিষয়ক ভাবনার ঢেউ যেরকমভাবে যখন-তখন আসছে, হঠাৎ কিছু ঘটিয়ে ফেলা অস্বাভাবিক নয় অখিলেশের পক্ষে।

সতেরো

উপযুক্ত একজন মনোবিদের সন্ধান পাওয়ার জন্য সহকর্মী এক সাংবাদিকের কাছে গেলেন অখিলেশ। এই মেয়েটি অখিলেশের সঙ্গে একই সংবাদপত্রে চাকরি করে। মেয়েটি একজন ফিল্ম জার্নালিস্ট। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজের সমস্ত স্তরের খ্যাতনামা ও কৃতী মানুষদের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কিন্তু অখিলেশ যে এই মেয়েটির কাছেই পরামর্শ নিতে গেলেন তার কারণ আলাদা। এই মেয়েটির মা কয়েকবছর আগে বিস্মরণের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ক্রমে তিনি তাঁর একমাত্র মেয়েকেই আর চিনতে পারতেন না। মেয়েকে মনে করতেন নিজের বড়দি, যে-বড়দি বহুকাল আগে মারা গেছেন। তখন এক মনোবিদ চিকিৎসার ভার নিয়ে পেশেন্টের অনেকটা উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হন।

কিন্তু এই সময় সেই মেয়েটির মা কোনও অজানা কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং কোমায় চলে যান। ওই চিকিৎসকের সহায়তায় মেয়েটি তার মাকে ফিরিয়ে আনার যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কোমা থেকে একটু-একটু করে ফিরে আসতে থাকেন মেয়েটির মা। মেয়েটি এক-একদিন অফিসে এসে বলত, "মা আজ একটু ভাল আছে। ডান পায়ের পাতাটা একবার নাড়াতে পেরেছে।" কোনওদিন বলত, "আজ একজন সিস্টার বললেন, মায়ের চোখের পাতা দু'বার কেঁপেছে।" মেয়েটির মা যেদিন চোখ খুলতে পারলেন সেদিন তো মেয়েটির আনন্দ আর ধরে না। যদিও বোধশক্তি কোনওদিন ফিরে আসেনি আর, বাঁচানোও যায়নি মেয়েটির মাকে। কিন্তু ওই চিকিৎসক, প্রধানত মনোবিদ হিসেবেই যার খ্যাতি— তিনি একটি নার্সিংহোমে মেয়েটির মাকে ভরতি করে, অন্যান্য চিকিৎসকদের সহায়তা নিয়ে, মোট সাড়ে তিন বছর বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন তাঁর পেশেন্টকে। অখিলেশ মেয়েটির মুখে সেই ডা. দাসের কথা বহুবার শুনেছিলেন।

এই মেয়েটি, অফিসের অন্যান্য সহকর্মীদের তুলনায় পৃথক ধরনের। অখিলেশের কোনও লেখা কোথাও বেরোলেই সে পড়ে। এমনকী অখিলেশের কবিতার বই-ও সে নিজের সংগ্রহে রাখে। একবার মেয়েটির বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অখিলেশ। পত্রপত্রিকায় অখিলেশের লেখা বেরোলে সে লেখায় একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া আলাদা কথা। কিন্তু কবিতার বই কিনে বাড়িতে রাখা? এতটা ঠিক একজন হার্ডকোর ফিল্ম জার্নালিস্টের কাছ থেকে আশা করেননি অখিলেশ।

অখিলেশ একদিন ফোন করে মেয়েটির বাড়িতে চলে গেলেন। বললেন, "ডা. দাসের সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেবে? ওঁর ফোন নম্বর জানি না, কোথায়-কোথায় চেম্বার জানি না। তাই তোমার কাছে এসেছি। একবার দেখাতাম ওঁকে।" অখিলেশের আশঙ্কা, মেয়েটি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে, কেন দেখাবেন? কী সমস্যা হচ্ছে? হঠাৎ সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে কেন?

এসব প্রশ্নের জন্য জবাবও তৈরি রেখেছিলেন অখিলেশ, "এখন খুব ভুলে যাচ্ছি। তিন পৃষ্ঠা লিখে চতুর্থ পৃষ্ঠায় যেতেই মনে পড়ে না প্রথম পৃষ্ঠায় কী লিখলাম। তাই ভাবছি একবার... তা ছাড়া ডা. দাস তো এখন কলকাতার একজন বড় মনোবিদ। তুমি তো ওঁকে দীর্ঘদিন চেনো..." মনে-মনে সব রিহার্সাল দিয়ে রেখেছিলেন অখিলেশ। কিন্তু মেয়েটি এতই ভদ্র, যে একটা অতিরিক্ত কথাও জানতে চাইল না। শুধু বলল, "দেখাতে চান? বেশ তো। আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আপনাকে জানিয়ে দেব। চা খাবেন তো? চা করি?"

অখিলেশ বললেন, "আজ আর চা খাব না। আর-একদিন। আজ একটু তাড়া আছে।"

মেয়েটি চা খাওয়ার জন্য জোর করল না। একবারও।

অখিলেশ বাড়ি ফিরতে-ফিরতে ভাবলেন, মেয়েটির পরিমিতিবোধ কত উচ্চমানের। হায়, অখিলেশের যদি এইরকম সেন্স অফ প্রোপোরশন থাকত, তা হলে তিনি কখনও এত অবিবেচকের মতো অত অল্পবয়সি একটি মেয়ের ভালবাসায়, এত মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়তেন না। ও অখিলেশকে অনায়াসে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারত, অথচ অখিলেশ ওকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারছেন না। বাস্তববোধবর্জিত একটি মানুষ অখিলেশ। নইলে কবে যে ওর কাছে অখিলেশ ফুরিয়ে গেলেন, অখিলেশ পুরোপুরি মূল্যহীন হয়ে পড়লেন, সেকথা একবারের জন্যও বুঝতে পারলেন না? অথচ এই ফিল্ম জার্নালিস্ট মেয়েটি বয়সে কত ছোট অখিলেশের চেয়ে। কিন্তু কী দারুণ এর ভারসাম্যজ্ঞান!

বাড়ি এসে অখিলেশ দেখলেন বাড়িতে সুরমা। সুরমাকে দেখে স্বস্তি পেলেন অখিলেশ। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারলেন না। তটস্থ হয়ে রইলেন ভয়ে। দেওয়ালে বারংবার ওই মাথা ঠোকার মুহূর্তটি মনে পড়ে গেল অখিলেশের। যদি আবার ওরকম উন্মত্ত হয়ে ওঠেন সুরমা, তা হলে কী করবেন অখিলেশ? টুকুন বাড়িতে রয়েছে। টুকুন আর টুকুনের মায়ের টুকরো-টুকরো কথা থেকে অখিলেশ বুঝতে পারলেন, টুকুনই তার মাকে অনেক বুঝিয়ে লেখিকার বাড়ি থেকে ফেরত এনেছে।

অখিলেশ পোশাক পরিবর্তন করে সবে এসে বসেছেন বাইরের ঘরের সোফায়, সুরমার গলা শুনতে পেলেন, "কী, প্রেমের তো একেবারে বন্যা এনে দিয়েছ কবিতায়? হ্যাঁ?" সুরমা বলে চলেছেন, "আমার সামনে এই বাইরের ঘরে বসে-বসে প্রেম করে গেলে, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না? তাও তো ধরে রাখতে পারলে না। মুখে ঝাঁটা মেরে চলে গেল। ঠিক করেছে। কত বড় শয়তান তুমি, তোমার মুখ দেখে কিছু ধরা যায় না। সব জায়গায় অভিনয় করে যাও, ভালমানুষের অভিনয়। লজ্জা করল না ওই কবিতা ছাপাতে? বিনীতা বলল আমাকে, 'সুরমাদি, উনি এসব কবিতা পাবলিশ করতে দিলেন, তুমি আপত্তি করলে না?' আমি কি জানি এরকম কবিতা লিখেছে ওর প্রাণেশ্বরীকে নিয়ে, আবার ছাপতেও দিয়েছে?"

টুকুন এগিয়ে এসে বলল, "মা থামো। ঘরে যাও। আমি চা দিয়ে আসছি।"

টুকুন তারপর অখিলেশের দিকে দুবার বলল, "তুমি চা খাবে তো?"

অখিলেশ বলতে গেলেন, "খাব", কিন্তু অপমানে লজ্জায় আর ভয়ে অখিলেশের গলা দিয়ে ভাঙা একটা আওয়াজ বেরোল, যে -আওয়াজ কিছু বোঝায় না।

টুকুন ধমক দিল, "কী হল? ভাল করে বলতে পারছ না চা খাবে কি না?"

সুরমা বললেন, "মিষ্টি-মিষ্টি প্রেমের কথা বলার সময় গলায় অনেক আওয়াজ ফুটবে, আমাদের কথার জবাব দেওয়ার সময় গলা বন্ধ।"

কেশে স্বর পরিষ্কার করে নিয়ে অখিলেশ বললেন, "হ্যাঁ খাব।"

অখিলেশ সোফায় বসে ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়তে শুরু করলেন। সুরমা বাথরুম গিয়েছিলেন। এখন বসার ঘর পেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছেন। ফেরত পথে দাঁড়িয়ে বললেন, "মুখখানা দেখো! কে যেন কালি

ঢেলে দিয়েছে। এত শোক! এত শোক! একটুখানি আমার জন্য আলাদা করে রাখো। আমি মরার পর লোক দেখানো শোকও তো একটু করতে হবে!"

রান্নাঘর থেকে টুকুনের কঠুত্বপূর্ণ গলা ভেসে এল, "মা, আবার? কতবার না বোঝালাম বিনীতাদির বাড়িতে? যাও, ঘরে যাও। আমি চা নিয়ে আসছি।"

অখিলেশ ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ছেন। তাঁর মাথা ঠেকে যাচ্ছে হাঁটুতে। এই ভঙ্গিতে অবস্থান করলে একটু যেন স্বস্তি পান অখিলেশ।

টুকুন চায়ের কাপ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে। বলছে, "ও কী! ওরকম কুঁকড়ে, ঝুঁকে বসে আছ কেন? সোজা হয়ে বোসো শিগগির।"

"অ্যা-হ্যা-হ্যা... সোজা হয়ে... এই তো," সোজা হয়ে বসেন অখিলেশ।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে খুব ঠান্ডা লাগল টুকুন বলে, "তুমি আমার মায়ের সঙ্গে যেটা করেছ সেটা একটা ক্রুয়েলটি। তুমি একটা ক্রট। তুমি অ্যাপোলজি চাইবে।"

অখিলেশ কোনওরকমে বলেন, "চাইছি। এই তো চাইছি। এক্ষুনি। ওই অ্যাপোলজি। চাইলাম..."

টুকুনের কণ্ঠের জবাব, "আমার কাছে না। মায়ের কাছে। যাও গিয়ে অ্যাপোলজি চাও।"

চায়ের কাপ সামনের ছোট টেবিলে রেখে দিয়ে অখিলেশ পা বাড়ান সুরমার ঘরের দিকে।

টুকুন বলে, "চা-টা কী হবে? চায়ের কাপটা নিয়ে যাও।"

অখিলেশ বলেন, "এসে নিচ্ছি, বাবা।"

টুকুনের উত্তর, "এখনই নেবে। এখনই। আমি কষ্ট করে চা বানালাম আর তুমি সেটা ফেলে রেখে ঠান্ডা করবে, পরে বলবে ঠান্ডা হয়ে গেছে এটা, আর খাব না— সে জিনিস চলবে না।"

একথা সত্যি, অখিলেশ ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চা খেতে পারেন না একদম।

অখিলেশ সুরমার ঘরে গিয়ে দাঁড়ান। হাতে চায়ের কাপ।

পিছনে টুকুন বলে, "কই, বলো!"

অখিলেশ বলেন, "সুরমা, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।"

সুরমার স্বর আগের মতোই কঠোর, "কী অন্যায়? কিসের অন্যায়?"

অখিলেশ আর কথা খুঁজে পান না। অনেক চেষ্টায় বলেন, "তুমি থাকা সত্ত্বেও অন্য আর-একজনের কাছে যাওয়া আমার অন্যায়। আমার দোষ হয়েছে। মাপ করো আমাকে।"

সুরমা খাটের উপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অখিলেশের কথা শুনে বলেন, "থাক। আর নাটক করতে হবে না! এখন আর ওসব বলে... এ কী, চোখে জল? পুরুষমানুষের কান্নার মতো ন্যাকা জিনিস আর হয় না। টুকুন, তুই এই জন্যই আমাকে বাড়িতে নিয়ে এলি বুঝি? ভগবান, আর কত নাটক দেখব..." বলতে-বলতে দুপদাপ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে যান সুরমা রান্নাঘরের দিকে।

"মা, তোমার চা পড়ে রইল," বলে চায়ের কাপ হাতে মাকে অনুসরণ করে টুকুন। ঘর থেকে বেরনোর সময় বলে, "তোমাকে কিছু বলাও যাবে না। এমন একটা সিন করলে! এতে কান্নার কী ছিল?"

বাইরের বসার ঘরে সুরমা আর টুকুন। সুরমার ঘরে একা অখিলেশ। অখিলেশের চোখ দিয়ে আবারও জল পড়ছে। রুমাল নেই। পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে চোখ মুছে নেন অখিলেশ। অখিলেশের মনে পড়ে ওর কথা। ওর সঙ্গে ওর স্যারের সম্পর্কটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর স্যারকে স্যারের স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। একথা শুনে অখিলেশ বলেছিলেন, "ভালবাসা তো কোনও অন্যায় কাজ নয়। উনি ক্ষমা চাইলেন কেন?"

ও বলেছিল, "আমার জীবনটা কত বড় একটা ফেলিওর দেখুন, আমাকে কেউ ভালবাসলে তাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমাও চাইতে হয়। আমিও তো ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম স্যারের স্ত্রীর কাছে।"

আজ অখিলেশের মনে হচ্ছে, এইমাত্র তিনিও ক্ষমা চাইলেন। ওকে ভালবেসেছিলেন বলে ক্ষমা চাইলেন।

তবে দুটো ঘটনার মধ্যে পার্থক্য একটা আছে। ও বলেছিল, "স্যার ওকে একসময় তাড়িয়ে দেন।"

আর অখিলেশকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছে ও। অখিলেশ ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার কথা কখনও কল্পনাও করেননি। আজ অখিলেশের মনে হচ্ছে, ওই যে অখিলেশ বলেছিলেন, 'ভালবাসা তো কোনও অন্যায় কাজ নয়। উনি ক্ষমা চাইলেন কেন?'

কথাটা অখিলেশ নিতান্ত নির্বোধের মতো বলেছিলেন। সাংসারিক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে দেখেননি। ওর প্রতি প্রেমের আবেগে ভাসতে-ভাসতেই বলেছিলেন কথাটা। সমাজে কোনও বিবাহিত পুরুষ বা নারী, নিজের স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসলেই সেটা অপরাধ। আর অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়াই উচিত। আর এই অপরাধের জন্য শাস্তি হচ্ছে বিচ্ছেদ। ওর আর স্যারের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ছিল। ওর স্বামী গোপন মেসেজ দেখে ফেলার পর চাপ দিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। এখানে ও নিজেই এই বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। ও অন্য কাউকে ভালবেসেছে? অখিলেশ বুঝতে পারেন কাকে ভালবেসেছে ও। এক্সপার্ট। ওই এক্সপার্টটিকে ভালবেসেছে ও। ওই এক্সপার্টের কথা বলতে গেলে ওর চোখমুখ আলো ঝলমলে হয়ে উঠত। অখিলেশ শেষের একমাস-দেড়মাস ভাবতেন ওর মুখের ওই আলোক বিচ্ছুরণ অখিলেশের জন্য। অখিলেশ ওকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখে ওকে ফোন করে শোনাচ্ছেন তখন নিয়মিত। আর দেখা হলেই ওর মুখের আলোকদ্যুতি দেখে ভাবছেন এই আলো অখিলেশের প্রতি ধাবমান। আসলে, ঠিক তার আগের দিন যে এক্সপার্টের সঙ্গে দেখা হয়েছে, এই ঝলমলে মুখ যে সেই দেখা হওয়ার মূল্য বহন করে আনছে, মূর্খের অধিক মূর্খ অখিলেশ, সেকথা বোঝেননি।

এখন ভাবলে ভিতরটা যন্ত্রণায় ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে থাকে। আবার জল গড়ায় অখিলেশের চোখ দিয়ে। ভয় পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে অখিলেশ পাঞ্জাবি তুলে মুছে ফেলেন অশ্রু। মা আর মেয়ে যদি তাঁর চোখে জল দেখে এই মুহূর্তে তীব্র অশান্তি শুরু হয়ে যাবে।

অখিলেশ নিজের পড়ার ঘরে ফিরে আসেন মা আর মেয়ের সামনে দিয়ে। পড়ার টেবিলে বসামাত্রই আবারও অখিলেশের মাথা ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়তে থাকে সামনের দিকে। ধীরে-ধীরে তাঁর মাথা ঠেকে যায় হাঁটুতে।

ঠিক এইসময়ে সুরমা এ ঘরে আসেন। সুরমা চেঁচিয়ে ওঠেন, "ও কী! ওরকম ঝুঁকে বসে আছ কেন?"

অখিলেশ তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে বসেন, কিন্তু তাঁর অশ্রুধারা গোপন থাকে না আর। সুরমা আবারও বেশ চেঁচিয়েই বলেন, "সেই নাকি-কান্না? এখনও ওর জন্য কেঁদে মরছ? টুকুন তুই এইভনং আমাকে বাড়িতে আনলি? দিনরাত্তির একজনের জন্য শোক করে চলবে, কান্না চলবে, আর আমাকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেটা দেখতে হবে? সকালেই আমি আবার বিনীতার বাড়ি চলে যাব।"

টুকুন এসে দাঁড়ায়। ধমক দিয়ে বলে, "চোখ মোছো। চোখ মুছে ফ্যালো। এক্ষুনি তুমি চোখ মুছবে।"

সুরমা বলল, "তুমি এদিকে সারাক্ষণ কেঁদে মরছ যার জন্য সে কত আনন্দ করছে জানো? গোপালপুর বেড়াতে গেছে। সমুদ্রের ধারে। কত ছবি পোস্ট করছে ফেসবুকে। এই দ্যাখো। দ্যাখো। জিন্স পরেছে। জিন্সের পা গুটিয়ে বসে আছে নৌকায়। মুখে কী হাসি! প্রোফাইল পিকচার করেছে সেটাই। চুল ছেঁটেছে নতুন কায়দায়। আর তুমি ঘরের কোনায় বসে মাত খাওয়া কুকুরের মতো কাতরে মরছ? ছিঃ, লজ্জাও করে না! একবার ছবিগুলো দেখো, নাও, হাতে নিয়ে দেখো— তোমার কান্না থেমে যাবে।"

দেখলেন অখিলেশ। ঠিক। ঠিকই বলেছেন সুরমা।

কিন্তু অখিলেশের বুকে একটা নতুন তির বিঁধেছে।

সমুদ্র! সমুদ্রে গেছে ও! বিদ্যুৎচমকে অখিলেশের মনে হানা দেয় একটা ঘটনা।

এই উকিলের কাছে বছর দশেক আগে আরও একটি মেয়েকে

পাঠিয়েছিলেন অখিলেশ-সুরমা। সেই মেয়েটির ডিভোর্সের মামলা লড়েছিলেন এই উকিল। সেই মেয়েটির সঙ্গে উকিলের প্রণয়সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে সেই সম্পর্ক ভেঙেও যায়। ভেঙে যাওয়ার পরে মেয়েটি আবার আসে অখিলেশ-সুরমার কাছে। তার কাছেই অখিলেশ-সুরমা জানতে পারেন প্রণয়সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরেই নাকি উকিল প্রস্তাব দেন সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাওয়ার। দিঘার হোটেলে কয়েকদিন একত্রে বসবাস করে আসেন দু'জনে। মেয়েটির তখন উকিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক। সদ্য ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক তো। সুরমা শুধু জানতে চেয়েছিলেন, "আপনার ডিভোর্সটা ওই ল-ইয়ার ঠিকমতো করিয়ে দিয়েছিলেন তো? যে-কাজে আপনাকে পাঠানো সে-কাজ ঠিকমতো হয়েছিল কি? মানে আপনি ডিভোর্স পেয়েছিলেন তো?" হ্যাঁ, সে-কাজ ঠিকমতোই সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু ডিভোর্স পাওয়ার আগেই ওই উকিলের সঙ্গে মেয়েটির প্রেম হয়ে যায়। ডিভোর্স পাওয়ার আগেই ওদের দিঘা যাওয়াও ঘটে।

সমুদ্র। আবারও সমুদ্র। এবার দিঘা নয় আর। গোপালপুর। অখিলেশের মনে এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় হয়ে বসে যায় ওর নতুন প্রেমিক সেই উকিল-ই। সেই এক্সপার্ট। এই উকিল সাধারণত ম্যাট্রিমোনিয়াল কেসই করেন। অনেক মেয়ের সঙ্গে সেইসূত্রে পরিচয় হয় তাঁর। সেইসূত্রে কারও-কারও সঙ্গে প্রণয়ও। কিন্তু ও?

একবার ওর সেই এক্সপার্টের মুখ মনে পড়ে অখিলেশের, একবার মনে পড়ে ওর মুখ।

অখিলেশ মনে হয় তাঁর মনের ভিতরটা যেন নরকের আগুনকুণ্ড হয়ে আছে।

টুকুন ও সুরমা দু'জনের কেউই এখন অখিলেশের ঘরে নেই। অখিলেশ একা। 'সমুদ্র' শব্দটা তাঁকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আবার একদিকে সুরমার ওইরকম আগ্রেয় প্রতিক্রিয়া, সঙ্গে টুকুনের ঠান্ডা তিরস্কার— অন্যদিকে ওর সমুদ্রতীরে মধুচন্দ্রিমার আনন্দ। দু'দিক থেকে এসে অখিলেশকে যেন একটি শ্বাসরুদ্ধকর কক্ষে বন্ধ করে রেখেছে। বেরোনার উপায় নেই আর।

আঠারো

অখিলেশ কোনও একজন মানুষের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে চান। কারও কাছে ভেঙে পড়তে চান। কিন্তু তেমন কোনও আপনজন আজ আর নেই অখিলেশের। অখিলেশের এখনও মাঝে-মাঝে মনে হয় ওর কাছে গিয়ে ভেঙে পড়তে পারতেন যদি? ওর মনে নিশ্চয়ই মমতা জাগ্রত হত অখিলেশের জন্য! পরক্ষণে ওই উকিলের মুখ মনে পড়ে। মনে পড়ে উকিলের স্বভাব। ব্যবহার মনে পড়ে। ওই উকিলকে বহুদিন যাবৎ চেনেন অখিলেশ। ওই উকিল প্রায়ই বলেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁকে কেস লড়তে ডেকে নিয়ে যায় কত লোক, গ্লেন ফেয়ার দিয়ে। তিনি কত লোকের উপকার করেছেন সেকথা বলেন প্রায়ই। তিনি বলেন, "মেয়েদের বাঁচানোই আমার কাজ। আমার আদর্শ।" নিজের মুখেই নিজের বিবিধ কৃতিত্বের কথা বর্ণনা করেন তিনি। আর অখিলেশ মুখচোরা এবং লাজুক স্বভাবের মানুষ। স্বভাবের দিক দিয়ে, আচরণের দিক দিয়ে অখিলেশের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন ওই ল-ইয়ার। দীর্ঘ ন'বছর ও অখিলেশকে দেখার পরে চলে গেছে অখিলেশের স্বভাবের ঠিক বিপরীত স্বভাবের একজন ব্যক্তির কাছে! প্রেমে পড়েই চলে গেছে। এই কথা ভাবলে অখিলেশের মনে যে-প্রবল একটা দাহ জন্ম নেয়, অখিলেশকে পুড়িয়ে ছারখার করতে থাকে যে -গোপন তুষানল, অখিলেশ বুঝতে পারেন তার একটি উৎসের নাম ঈর্ষা। অন্যটি বিচ্ছেদবেদনা। অখিলেশ লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করেন, প্রচণ্ড সবল এক ঈর্ষাশলাকা তপ্ত অবস্থায় ঢুকে গেছে অখিলেশের বুকে। অখিলেশ প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই শলাকা উপড়ে ফেলতে পারছেন না। অখিলেশ আশঙ্কা করছেন, আজকে রাতেও ঘুম হবে না তাঁর। অপরিমিত ঘুমের ওষুধও তাঁকে শান্ত নিদ্রার কোলে ঠেলে দিতে পারে না এখন।

ফিল্ম জার্নালিস্ট মেয়েটির কাছ থেকে ফোন এল তিন দিনের মাথায়। ডা. সত্রাজিৎ দাসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া গেছে। কোথায় চেম্বার তাও জানিয়ে দিল মেয়েটি। অখিলেশ ধন্যবাদ জানালেন মেয়েটিকে। মেয়েটি একটি ফোন নম্বর দিয়ে বলল, সকাল এগারোটা নাগাদ এই ক্লিনিকে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কনফার্ম করে নিতে। এই ক্লিনিকেই উনি সপ্তাহে তিনদিন বসেন। অখিলেশ মেয়েটির কথা মতোই কাজ করলেন।

ডা. দাসের চেম্বারে যখন ঢুকলেন অখিলেশ তখন সন্ধে ছ'টা বাজে। অখিলেশ ছাড়াও আরও তিনজন বসেছিলেন অপেক্ষা-ঘরে। একজন ওই ক্লিনিকের কর্মী। অন্য দু'জন মনে হল মা আর মেয়ে। আগের পেশেন্ট বেরিয়ে যেতেই সেই মা আর মেয়ে ঢুকে গেলেন ঘরে। অখিলেশ বারবার ভেবে রাখা পয়েন্টগুলি আবার একবার নতুন করে ভেবে নিতে শুরু করলেন। বারবারই পয়েন্টগুলির খেই হারিয়ে যেতে লাগল। অখিলেশের মনে হচ্ছে, সমস্তটা জড়িয়ে একটা পিণ্ডাকার ধাতব পদার্থ হয়ে উঠেছে যেন— যার দুর্বহ ভারই শুধু অনুভব করা যায়, মুখে বলতে পারা যায় না। এক-একগাছি সুতোর মতো পয়েন্টগুলিকে একটি-একটি করে আলাদা করা দরকার এখন। অথচ সে-কাজ অখিলেশ কিছুতেই করে উঠতে পারছেন না।

মা আর মেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফোন ধরা কর্মীটির কণ্ঠস্বর অখিলেশের প্রতি ভেসে এল, "এবার আপনি।" মোবাইল সাইলেন্ট করতে গিয়ে অখিলেশ দেখলেন ঘড়িতে ছ'টা চল্লিশ। অখিলেশ ডাক্তারের চেম্বারের দরজা ঠেলে ঢুকে গেলেন।

অখিলেশ চেম্বার থেকে বেরিয়ে যখন মোবাইল বার করলেন ড্রাইভারকে ফোন করার জন্য, তখন ঘড়িতে দেখলেন সাতটা চুয়ান্ন। চমকে গেলেন অখিলেশ। ডা. দাস তার মানে অখিলেশের সঙ্গে কথা বলেছেন সত্তর মিনিটেরও বেশি সময় নিয়ে? এতটা আশা করেননি অখিলেশ।

গাড়িতে উঠে অখিলেশ নিকটবর্তী ওষুধের দোকানে পৌঁছলেন প্রথমে। ডা. দাসের লিখে দেওয়া ওষুধগুলি কিনলেন। তারপর অফিসের ফিল্ম জার্নালিস্ট মেয়েটিকে ফোন করলেন। কারণ, তার মিস্‌ড কল দেখাচ্ছিল মোবাইল। মেয়েটি বলল, "আজকে আপনার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। তাই ফোন করেছিলাম। গিয়েছিলেন তো?"

অখিলেশ বলেন, "গিয়েছিলাম। সত্তর মিনিটেরও বেশি সময় কথা বলেছেন আমার সঙ্গে। আমি এতখানি আশা করিনি।"

মিতভাষ মেয়েটির সংক্ষিপ্ত উত্তর, "উনি ওইরকমই। ওষুধ কি দিয়েছেন কিছু?"

অখিলেশ বলেন, "তিনটে ওষুধ দিয়েছেন।"

মেয়েটি বলে, "নিয়ম করে খাবেন ওষুধগুলো। একটু কি হালকা লাগছে এখন?"

অখিলেশ বলেন, "কিছুটা।"

গাড়ি অখিলেশের বাড়ির রাস্তায় বাঁক নেয়। বাড়ি, অখিলেশ ভাবেন, আবারও বাড়ি। আবারও ঠান্ডা আর কঠোর ব্যবহার।

মেয়েটি বলে, "আমি পরে খবর নেব। আর আমাদের কলামটা পরশুদিন পেলে ভাল হয়।"

অখিলেশ বলেন, "হ্যাঁ, পরশু দিয়ে দিতে পারব।"

এই কাগজে দু'টি পাক্ষিক কলাম লেখেন অখিলেশ। তার একটি কলামের জন্য যোগাযোগ করেন এই মেয়েটি।

এতদিন পরে, সত্যিই, একটু হলেও হালকা লাগছে অখিলেশের। রাতে শুতে যাওয়ার আগে ওষুধ তিনটি খাওয়ার কথা। প্রথমে একটা। তার আধঘণ্টা পরে আরও দুটো, একসঙ্গে খেতে হবে। ডাক্তার পুরনো ওষুধ সব বন্ধ করে দিয়েছেন। শান্তভাবে তিরস্কার করেছেন এত বেশি পরিমাণে ওই ওষুধগুলি খাওয়ার জন্য। অখিলেশ সেদিন শুয়ে পড়ার আধঘণ্টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল একেবারে সকাল সাতটায়। শুয়ে-শুয়ে কেবল ছটফট করা আর একের পর এক ঘুমের ওষুধ খেয়ে যাওয়ার প্রাত্যহিক ঘটনাটা আজ আর ঘটল না।

ডা. দাস শান্তভাবে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন অখিলেশকে।

সকালে বসার ঘরে চায়ের কাপ হাতে আবার ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়তে লাগলেন অখিলেশ। চায়ের কাপ পাশে রেখে মাথাটা হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখলেন। ওইসময় আবার সুরমার ধমক, "ওরকম কুঁকড়ে বসে আছ আবার? এই তো সবে মাত্র ডাক্তার দেখিয়ে এলে। এখনও শোক যাচ্ছে না?"

অখিলেশ সোজা হয়ে বসলেন। আসলে, সকালে উঠে তো একবার মনে পড়েই ও ছেড়ে গেছে অখিলেশকে। আর কখনও আসবে না। আজকেও সে-কথাটা মনে পড়েছে। চায়ের কাপ হাতে যখন চেয়ারে বসেছেন অখিলেশ তখন মনে পড়েছে অন্য একটা কথা। LOVE U লেখা মেসেজ কি ও এখন ওর এক্সপার্টকে পাঠায়? সঙ্গে-সঙ্গে অখিলেশ ভেবেছেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাঠায়। একথা মনে হওয়া মাত্রই অখিলেশের মাথা ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে নিজের হাঁটুর দিকে।

গত সন্ধ্যায় ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাতে শোওয়ার সময়ও কি ওইভাবে হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে শুতে ইচ্ছে করে আপনার? অখিলেশ বলেছিলেন, "এমনিতে আমি পাশ ফিরে শুই। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুম আসে না, একের পর এক স্মৃতি মনে পড়তে থাকে, ওর স্মৃতি, আর একের পর এক ঘুমের ওষুধ খেতে থাকি, সেই সময়টায় কখন যেন হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকে যায়। তখন ওইভাবেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।"

গত সন্ধ্যায় ডা. দাস শান্তভাবে পরপর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন অখিলেশকে। কারণ, প্রথমে অখিলেশ কিছুই বলে উঠতে পারছিলেন না। প্রশ্ন করে-করে, সব ঘটনা অখিলেশের ভিতর থেকে নিষ্কাশন করে নিয়েছিলেন ডা. দাস। কেবল ঘটনাটুকুই নয়, ডা. দাসকে নিষ্কাশন করে নিতে হয়েছিল অখিলেশের সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকেও। ডা. দাস প্রশ্ন করছিলেন বেশি। কথা বলছিলেন কম। শেষ দশ-বারো মিনিট একটানা কথা বলে গিয়েছিলেন ডা. দাস-ই। বলেছিলেন, "আপনার সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল, সে যখন সেই সম্পর্ক ছিঁড়ে চলে গেল— তখন আপনার মনেরও একটা বড় অংশ ছিঁড়ে চলে গেল তার সঙ্গে। কারও যদি একটা পা কাটা যায়, তার বাকি শরীরটা যন্ত্রণায় দাপাবে তো? আপনার মনের যে-অংশটি আপনার সঙ্গে রয়ে গেছে সেই অংশটি এখন দাপাচ্ছে। এই সম্পর্কের ভেঙে যাওয়া আপনার কাছে একটা মৃত্যুর মতো। মৃত্যুতে শোক থাকে, কিন্তু সামাজিক অপযশ থাকে না। তবে এই ধরনের সম্পর্কের মৃত্যুতে সামাজিক, পারিবারিক অপযশ হয়।"

অখিলেশ বলেছিলেন, "হচ্ছে। আমার সেটাই হচ্ছে। যখনই আমার কষ্ট আমি আর লুকিয়ে রাখতে পারছি না, তখনই অশান্তি হচ্ছে বাড়িতে।"

ডা. দাস বলেছিলেন, "হবেই। কিন্তু আপনি এটা মেনে নিন যে, সেই মহিলা আর কোনওদিন আপনার কাছে ফেরত আসবেন না।"

অখিলেশ বলেছিলেন, "আমি মেনে নিয়েছি। পুরোপুরি। ও আর কখনও আসবে না। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারছি না।"

আরও কিছু-কিছু কথা বলেছিলেন ডা. দাস। হঠাৎ একসময় বললেন, "আপনার কি ওখানে বসতে সমস্যা হচ্ছে কিছু?"

অখিলেশ ঠিক বুঝতে পারেন না। বলেন, "কোথায় বসতে?"

ডা. দাস আঙুল দিয়ে অখিলেশের বসার জায়গাটি নির্দেশ করে বলেন, "এই এখন যেখানে বসে আছেন?"

ডাক্তারের চেয়ারের পাশে গদিমোড়া একটি চওড়া বাক্সের আকারের টুল রাখা ছিল। সেখানে বসেছিলেন অখিলেশ। ডাক্তারের চেয়ারের সামনে কাঁচ বসানো টেবিল। টেবিলের সামনে দু'টি চেয়ার, ঠিক ডাক্তারের বিপরীতে।

ঘরে ঢুকে নমস্কার করে সেই চেয়ার দু'টির একটিতে বসতে গিয়েছিলেন অখিলেশ। ডা. দাস হাতের ইশারা করে ডাক্তারের চেয়ারের বাঁ পাশে রাখা ওই গদি মোড়া চওড়া টুলটি দেখান অখিলেশকে। বলেন, "এখানে বসুন," সঙ্গে-সঙ্গে এও বলেন, "আমার পেশেন্টরা সব এখানে বসেই কথা বলেন। পেশেন্টের সঙ্গে যদি কেউ আসেন তাঁদের বসার জন্য ওই চেয়ার দু'টি রাখা। বলুন, আপনার কী

সমস্যা হচ্ছে?"

দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ব্যক্তি এই মনোবিদ। টেবিলের নীচে তাঁর জুতো খুলে রাখা আছে। খালি পা দু'টি টেবিলের তলার দু'টি কোণে আশ্রয় পেয়েছে।

কী সমস্যা হচ্ছে বলতে গিয়ে প্রথমেই চোখে জল এসে পড়ে অখিলেশের। অখিলেশের মতো পরিণত বয়সের লোককে অশ্রুপাত করতে দেখলে যে-কেউ অপ্রস্তুত হবে, অন্তত কিছুটা বিস্ময় বোধ করবে। ডা. দাস অবিচল রইলেন। বললেন, "আপনি ঠিক হয়ে নিন আগে। এখনই কিছু বলতে হবে না। যদি মনে হয় কান্না পাচ্ছে তবে লজ্জা করবেন না। আমরা সবাই কান্না গোপন করে রাখি। সেটাই সামাজিক নিয়ম। কিন্তু সকলেরই কোনও না কোনও কারণে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আপনার যদি কান্না আসে তবে সেটা বেরিয়ে যেতে দিন। আমরা তা হলে খোলাখুলি কথা বলতে পারব। লজ্জা পাবেন না। কান্না কোনও লজ্জার ব্যাপার নয়।"

অখিলেশ তাঁর উদ্যত কান্নাকে রুমালে চেপে ধরতে পারলেন। তারপর বলে উঠলেন, "একটি মেয়ে, ডা. দাস, একটি মেয়ে।"

ডা. দাস তাঁর অবিচলিত স্বরে স্নেহ মিশিয়ে বলেন, "একটি মেয়ে। বুঝলাম। মেয়েটি কে? আপনার প্রেমিকা?"

অখিলেশ নাক মুছতে-মুছতে বলেন, "ও আমার প্রেমিকা এই কল্পনা একসময় আমাকে খুশি রাখত।"

ডা. দাস বললেন, "খুশি রাখত? মানে এখন আর রাখছে না? কেন রাখছে না?"

অখিলেশ কোনওমতে বলতে পারেন, "কারণ, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

ডা. দাসের সেই অবিচলিত স্বর। স্নেহের বদলে সেই স্বরে এখন খুঁটিয়ে জানবার ইচ্ছে তীক্ষ্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, "ছেড়ে চলে গেছে। আচ্ছা। ছেড়ে চলে যাওয়া অনেকরকমভাবে হতে পারে। কি, পারে না?"

অখিলেশ আত্মরুদ্ধ স্বরে জবাব দেন, "পারে।"

আবার একটু স্নেহ ফিরে আসে ডা. দাসের কণ্ঠস্বরে, "আপনার ক্ষেত্রে কীভাবে সেই ছেড়ে যাওয়াটা ঘটেছ?"

এইভাবে, প্রশ্নের পর প্রশ্নের ভিতর দিয়ে অখিলেশকে ঘটনার একেবারে কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ফেললেন ডা. দাস। তারই মাঝখানে একবার, তার প্রশ্নমালার বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি ওখানে বসতে কোনও সমস্যা হচ্ছে?"

কারণ, ঘটনাক্রম ও নিজের মানসিক অবস্থা এবং পারিবারিক পরিস্থিতির বিবরণ দিতে-দিতে অখিলেশ প্রায়ই সামনের দিকে ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ছিলেন। ডা. দাস বললেন, "আপনি এইভাবে ঝুঁকে পড়ছেন কেন? সামনের চেয়ারে বসলে কি কমফর্টেবল ফিল করবেন? তা হলে চেয়ারেই বসুন।"

তখন অখিলেশ বলেছিলেন তাঁর এই অভ্যেসটা দেখা দিয়েছে ও চলে যাওয়ার পর। এবং স্ত্রী-কন্যার কাছে ধারাবাহিকভাবে তিরস্কৃত হওয়ার পর। একসঙ্গে এই দুটো চাপ এসে যাওয়ার পর থেকে অখিলেশ নিজের অজান্তেই ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়েন এবং হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে রাখলে সাময়িক স্বস্তি পান।

অখিলেশ এখন স্নান করতে এসেছেন বাথরুমে। স্নান করার সময়টায় অখিলেশ সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়লেই যে ওই সময়টিতে ওর কাছ থেকে পাওয়া অতর্কিত আঘাত মনে পড়ে, উকিলকে দিয়ে পাঠানো মেসেজ, সব, সবই মনে পড়তে থাকে— আবার উজ্জ্বল দু'টি চোখের তাকিয়ে থাকাও মনে ভেসে ওঠে— তার সবটুকুই অখিলেশের কাছ থেকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন ডা. দাস।

অখিলেশ আজ স্নান করতে-করতে ওর কথা ভাবছেন না। উকিলকে দিয়ে পাঠানো মেসেজের কথাও অখিলেশের ভাবনায় আসছে না আজ। উজ্জ্বল দু'টি আঁখিতারাও মনে পড়ছে না অখিলেশের। অখিলেশ ভাবছেন গতসন্ধ্যায় ডা. দাসের বলা একটি বিশ্লেষণ।

বসে থাকার সময় কী কারণে অখিলেশের মাথা বারবার ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়ে এবং মাথা হাঁটুতে ঠেকে গেলে কেন অখিলেশ সাময়িক স্বস্তি পান, সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলেন ডা. দাস। গতবাসকালে শিশু যে-ভঙ্গিতে থাকে, ভেবে দেখতে গেলে, অখিলেশ বারবার গর্ভস্থ শিশুর ভঙ্গিমায় ফিরে যেতে চাইছেন। যেহেতু কোথাও নিজের কোনও আশ্রয় আছে বলে আর বিশ্বাস সেই অখিলেশের, তাই মাতৃজঠরে ভ্রূণের যে-অবস্থানভঙ্গিমা, সেই ভঙ্গিটিতে বারবার ফিরে যেতে চাইছে অখিলেশের অবচেতন মন। কারণ, মাতৃগর্ভে শিশু কোনও আঘাতের আশঙ্কা করে না। গত ন'বছর যাকে আশ্রয় বলে মনে করেছেন অখিলেশ, সে একেবারে আকস্মিকভাবে ছেড়ে গেছে— আর যে-পরিবারে অখিলেশ বাস করেন, সেখানে প্রেমের কথা স্বীকার করার পরে, তারাও অখিলেশকে অপরাধী মনে করেও ও তীব্র তিরস্কার করেই চলেছে অখিলেশকে। এই দু'দিকের আঘাত ও চাপে অখিলেশ নিজের জ্রূণাবস্থায় ফিরে যেতে চাইছেন নিজের অজান্তেই।

এই বিশ্লেষণটি অখিলেশকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল! আজ স্নান করতে-করতে সেই বিশ্লেষণটিই শুধু ভাবছিলেন তিনি। স্নান করে বেরনো মাত্র টেবিলে রাখা সেই ক্যালেন্ডারে চোখ পড়ল। মনে পড়ে গেল ডা. দাস বারবার করে বলে দিয়েছেন দিন গোনার অভ্যেসটি ত্যাগ করতে হবে। ডেট ক্যালেন্ডার দেখে তবু মনে পড়ে গেল আজ কতদিন হল! ওকে না দেখার কততম দিন। মনে পড়লই!

উনিশ

ডা. দাসের কাছে নিয়মিত যাওয়া শুরু করতে হল অখিলেশকে। দু'সপ্তাহে একদিন অথবা সপ্তাহে একদিন। ডা. দাসের সঙ্গে কথা বলার পর একঘণ্টা বা দেড়ঘণ্টা সময় অখিলেশের মনের ভিতরকার সেই ভার কিছুটা হালকা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবার সেই দমবন্ধ করা অবস্থা ফিরে আসতে থাকে। ডা. দাসকে অখিলেশ বলেছেন, কয়েকটি বিশেষ শব্দ শুনলেই অখিলেশের সেই কষ্টটা শুরু হয়ে যায়। টুকুন বা টুকুনের বন্ধু রোমি যখন ফোন করে উবর ডাকে, ফোনে উবর ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে, আপনি কোথায় আছেন? এই রাস্তা দিয়ে আসুন, এরপর বাঁদিকে ঢুকবেন, এসে গেছেন, আচ্ছা ওখানে দাঁড়ান, আমি পৌঁছচ্ছি— এইসব কথা কখনও-কখনও ওরা হিন্দি ভাষাতেও বলে— তখন শুনতে-শুনতে অখিলেশের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। কষ্টে। ও-ও ঠিক এইরকম করে ফোনে উবর ডাকত, উবর ড্রাইভারের সঙ্গে এইভাবেই কথা চালাত। আর গীতবিতান কথাটিও সহ্য করতে পারেন না অখিলেশ। বাড়িতে টুকুন খেয়ালখুশি মতো গান গায়। ছোটবেলা থেকেই টুকুনকে বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে পাঠিয়েছিলেন অখিলেশ-সুরমা, গান শেখার জন্য। ক্ল্যাসিকাল থেকে রবীন্দ্রসংগীত— কিছুই বাদ রাখেননি তাঁরা। কিন্তু গান শিখতে মন যায়নি টুকুনের। জীবনে একদিনের জন্যও রেওয়াজ করল না। বাড়িতে একটা হারমোনিয়াম কেনা হয়েছিল টুকুনের আট বছর বয়সে। টুকুনের এখন আটাশ। এই কুড়ি বছরে টুকুন হারমোনিয়াম বাজাতে শিখল না। গান শিখতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত গাড়ি ভাড়া নিয়ে। সেই পয়সা দিয়ে রাস্তার টুকিটাকি খাবার কিনে খেয়ে হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফিরে আসত। বাড়ি থেকে বেশি দূরে কখনওই যেত না। টুকুনকে বহু চেষ্টা করেও কখনও গানা সাধতে বসানো যায়নি। কিন্তু টুকুন রোজই একবার, কখনও দু'বার গান গায় গলা ছেড়ে। এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে-যেতে, স্নান করতে ঢুকে অথবা অফিস থেকে ফিরে, বাইরের ঘরের সোফায় বসে গান গায়। স্নান করার সময়টা ছাড়া, অন্যান্য সময় যখনই টুকুনের গান গাইবার ইচ্ছে হয়, টুকুন বলে, "গীতবিতান কোথায়?"

শব্দটা শুনলেই বুকের ভিতর যেন দপ করে কী একটা নিভে যায় অখিলেশের। কারণ, ও যখন অখিলেশের জীবনে ছিল, কখনও-কখনও এ-বাড়িতে এসে প্রথম কথাটিই বলত, "গীতবিতান কোথায়?" শুধু গীতবিতানের নামটুকু শুনলেই অখিলেশের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। অথচ গীতবিতান বইটি খুলে ধরে সোফায় বসে টুকুন গান গায়। বইটির

দিকে তাকাতে পারেন না অখিলেশ। গান গাওয়া হয়ে গেলে ওই অখণ্ড গীতবিতান সোফার উপরেই রেখে উঠে যায় টুকুন। বইটি দেখলেই অখিলেশের মন পড়তে থাকে, একেবারে ঝড়ের মতোই মনে পড়তে থাকে পুরনো কথা সব। অখণ্ড গীতবিতান বইটিকে সাক্ষী রেখেই কত-কত আশ্চর্য সুন্দর মুহূর্ত ওর সঙ্গে যাপন করেছেন অখিলেশ।

একইভাবে রবীন্দ্রনাথ নামটিও অখিলেশ সহ্য করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ শব্দটি শুনলেই মনে পড়ে যায়, অখিলেশ কতবার রবীন্দ্রনাথ নামটি শুনেছেন ওর মুখে। 'বেস্ট অফ লাক' কথাটিও অখিলেশ সইতে পারেন না। ওর কোথাও কোনও সেমিনার থাকলে, কনফারেন্স থাকলে প্লেনে ওঠার আগে ও ফোন করত। বলত, "আমাকে একটা বেস্ট অফ লাক পাঠান, যেন প্রেজেন্টেশন ভাল হয় আমার। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আছে।" হয়তো অখিলেশের বেস্ট অফ লাক মেসেজ পাঠাতে দেরি হল, কাজে-কর্মে ব্যস্ত অখিলেশ ভুলে গিয়েছেন হয়তো— গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই ফোন, "কই, বেস্ট অফ লাক পাঠালেন না তো?" অখিলেশ তৎক্ষণাৎ মেসেজ পাঠাতেন। ওর সে সময় কেমন একটা বিশ্বাস ছিল অখিলেশ বেস্ট অফ লাক মেসেজ পাঠালে ওর প্রেজেন্টেশন ভাল হবে। ও কলকাতার বাইরে কোথাও গেলেই দু'পক্ষ থেকে ক্রমাগত ফোন ও মেসেজ নিয়মিয় চলতে থাকত।

ও যে ছোট ফ্ল্যাটটিতে থাকে সেখানে রান্না করার জন্য একটা ইন্ডাকশন ছিল। নিশ্চয়ই এখনও আছে। সুরমার কাছে সেই লেখিকা এসেছেন, যাঁর বাড়িতে সুরমা গিয়ে উঠেছিলেন দেওয়ালে মাথা ঠোকার পর। সুরমা আর ওই লেখিকা কথা বলছেন, এ ঘরে বসে শুনতে পাচ্ছেন অখিলেশ, তাঁদের কথার মধ্যে বারদুয়েক ইন্ডাকশন শব্দটি এল— ওই লেখিকাও ইন্ডাকশন ব্যবহার করেন। আবার বুক ভার হয়ে উঠল অখিলেশের। স্মৃতির মধ্যে ফিরে এল সেইসব দৃশ্য। অখিলেশ-সুরমা ওর ফ্ল্যাটে গেছেন, বাইরের বসার জায়গাটায় বসেছেন দু'জনে। সামনেই কিচেন, কিচেনে ইন্ডাকশনে জল গরম হচ্ছে। ওই জল ফুটলে ওর আর সুরমার কফি বানানো হবে। অখিলেশের জন্য হবে চা। সে সব সুন্দর দিন চিরতরে অতীত হয়ে গেছে, শুধু ইন্ডাকশন শব্দটি কাঁটার মতো বিঁধে হয়ে আছে অখিলেশের মনে।

অখিলেশ লেখালেখি করেন। অখিলেশের সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন, তিনিও লেখালেখির লোক। এক কবির প্রসঙ্গ উঠেছে। অখিলেশ জানিয়েছেন, সেই কবির কবিতা খুবই ভাল লাগে তাঁর। অন্যজন সে কথা শুনে বললেন, "হ্যাঁ, উনি তো ছন্দমিলে একেবারে এক্সপার্ট।" তারপরেও অন্যজন কথা বলে চলেছেন কবিতা নিয়ে— কিন্তু কিছুই আর কানে ঢুকছে না অখিলেশের। অখিলেশের বক্ষপঞ্জর ভেদ করে একটি বল্লম ঢুকে গেছে। এক্সপার্ট! এই শব্দটি বল্লম ধ্ব বুলে ঢুকে গেছে অখিলেশের বুকে। অখিলেশ শ্বাস নিতে পারছেন না।

দু'সপ্তাহে একবার তো অখিলেশকে যেতেই হয় ডা. দাসের চেম্বারে। ডা. দাসকে অখিলেশ সবটুকু খুলে বলেন। ডা. দাস অখিলেশকে বললেন, "আসলে ওই শব্দগুলোর সঙ্গে যা-যা অ্যাসোসিয়েশন আছে সেই মহিলার, সেইসবই আপনার মনে পড়ে যাচ্ছে। আর আপনার ইমোশনকে তখন আর আপনি কন্ট্রোল করতে পারছেন না।"

অখিলেশ বলেন, "বিশ্বাস করুন ডা. দাস, আমার ইমোশনকে আমি প্রাণপণ কন্ট্রোল করি। কাউকে এসব কথা কিচ্ছু বলি না। বাথরুমে ঢুকে যাই। ঝরঝর করে কাঁদি। কিন্তু কান্নার কোনও শব্দ হয় না। কল খুলে চোখে-মুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দিয়ে টাওয়েলে মুখ ভাল করে মুছে বাইরে আসি। কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে না।"

অখিলেশ ডা. দাসের কাছে এলে এখন অনর্গল কথা বলে চলেন, ডা. দাস চুপ করে শোনেন। অখিলেশ বলছেন, "ওই লেখিকা, বিনীতা, সেদিন এসেছিলেন আমাদের বাড়ি, যিনি আমাকে বলেছিলেন তাঁর স্বামী অমন কবিতা লিখলে তিনি তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে বের করে দিতেন। সেদিন উনি সুরমার সঙ্গে ইন্ডাকশন নিয়ে কথা বলছিলেন, আর আমার মনে পড়ছিল ওর ছোট্ট নিরিবিলি ফ্ল্যাটটির কথা। আমি আর সুরমা কত গেছি, ওই ইন্ডাকশনে লুচি, বেগুনভাজা, সাদা আলুর তরকারি করে খাইয়েছে আমাদের কতদিন। আমার ইন্ডাকশন শব্দটা শুনে মনে হচ্ছিল আমি যেন অনেকক্ষণ ধরে একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। ঘুম ভেঙে জেগে উঠেই দেখব ও আবার আমার জীবনে ফিরে এসেছে। আমার এখনও কেমন বিশ্বাস হয় না সত্যি-সত্যি ও আমায় ছেড়ে চলে গেছে।"

ডা. দাস বলেন, "শি চোজ় টু গো। এখন আর ওই মহিলার মধ্যে আপনার জন্য বিন্দুমাত্র ইমোশন অবশিষ্ট নেই। যদি আপনি ওঁকে ছেড়ে আসতেন, তা হলে ওঁর মধ্যে আপনার জন্য কিছু না কিছু ফিলিং থাকত। কিন্তু এখন আর নেই কিছু, অন্তত আপনার জন্য কিছু নেই ইন হার মাইন্ড। আপনি মর্মান্তিক কষ্ট পাবেন, এটা জেনেই উনি আপনাকে ছেড়ে গেছেন।"

অখিলেশ ভাবলেন, ঠিকই তো! ওই প্রফেসর, যাকে ও স্যার বলে ডাকত, সেই স্যারের প্রসঙ্গ অখিলেশের কাছে একথা-সেকথায় কতবার তুলেছে। এমনকী সম্পর্ণপ ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার কয়েকবছর পরে সেই স্যারের জন্মদিনে একবার মেসেজও পাঠিয়েছিল। কেন? কারণ, ওর ভাষায়, "স্যার আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।" তাড়িয়ে দেওয়ার এত বছর পরেও জন্মদিনে শুভেচ্ছা? কতখানি ফিলিংস তখনও ছিল ওর মনে স্যারের জন্য!

আর অখিলেশের ক্ষেত্রে! শি চোজ় টু গো। ফলে অখিলেশের জন্য ওর মনে আর কিছু নেই। কিছু নেই। এইজন্যই ডা. দাসকে এত নির্ভর করেন অখিলেশ। চোখে আঙুল দিয়ে সত্যিটা দেখিয়ে দিতে পারেন এই ডাক্তার।

অখিলেশ অসহায়ের মতো বললেন, "আমি তবে এখন কী করব ডা. দাস? আমার এই মনটা নিয়ে আমি কী করব?"

ডা. দাস একটা পদ্ধতি অনুশীলন করতে বলে দিলেন অখিলেশকে। এ ছাড়া ওষুধ সামান্য বাড়িয়ে দিলেন। অখিলেশ বাড়ি গিয়ে সেই পদ্ধতির অনুশীলন শুরু করলেন।

অখিলেশ একটা বড় সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিলেন তাঁর লেখার খাতা থেকে। তারপর সেখানে বড়-বড় অক্ষরে উপর থেকে নীচে কয়েকটা শব্দ লিখলেন। শব্দগুলি হল এইরকম:

উবর
গীতবিতান
এক্সপার্ট
ইন্ডাকশন
সালোয়ার কামিজ়
স্যার
বেস্ট অফ লাক
সমুদ্র
পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজ়েন্টেশন
সেমিনার
রবীন্দ্রনাথ
কনফারেন্স

ঘর বন্ধ করে রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, জোরে-জোরে উচ্চারণ করে শব্দগুলি পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন অখিলেশ। চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলেন, পারবেন না। অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গে একটা ভয় হচ্ছে। এই চেষ্টা চালাতে গেলে রাতে হয়তো আর ঘুমোতে পারবেন না। আবার সেই ঘুম না হওয়া কালো রাত্রিগুলো, ওর হাজার স্মৃতিহরা রাত্রিগুলো যেন ঝাঁপিয়ে আসছে এক-একটা শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে।

অখিলেশ স্থির করলেন দিনের বেলা চেষ্টা করে দেখবেন।

সকালে উঠে সুরমাকে বললেন, "আজ সন্ধেবেলা একটা অনুষ্ঠানে আমার কবিতাপাঠ আছে। সে জন্য পড়াটা একটু অভ্যেস করে নিতে চাই। দরজাটা বন্ধ করে পড়ার ঘরে একটু বসছি।"

সুরমা বললেন, "কই, এত জায়গায় এতদিন ধরে কতবার তোমাকে কবিতা পড়তে দেখেছি। কখনও তো আগে-আগে প্র্যাকটিস করে নিতে

দেখিনি। দরজা বন্ধ করে কি এখন ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলবে?"

সুরমা বিশ্বাস করেন, ওর সঙ্গে এখনও অখিলেশের একটা কোনও গোপন যোগাযোগ আছে।

অখিলেশ বললেন, "ও আর কখনও আমার ফোন ধরবে না, সুরমা।"

সুরমা বলেন, "কোন ধরবে না বলে দুঃখে একেবারে মরে যাচ্ছ। ভগবান, এও ছিল আমার আমার কপালে! যাও, দরজা বন্ধ করে যত খুশি প্রেমালাপ করো, আমি ও ঘরে ঢুকব না।"

সুরমার কণ্ঠের ভাষা দিনে-দিনে কঠোরতর হয়ে উঠছে। অখিলেশ ভাবেন, তিনি যেমন অতর্কিতে একটি আঘাত পেয়েছেন যা প্রত্যাশা করেননি, উলটোদিকে সুরমাও তাঁর স্বামীর কাছ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত আঘাতই পেয়েছেন। সুরমাকে দোষ দেওয়া যায় না।

পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে অখিলেশ উচ্চারণ করে পড়তে শুরু করলেন, "উবর, গীতবিতান, এক্সপার্ট, ইন্ডাকশন, সালোয়ার কামিজ... আর এগোতে পারলেন না অখিলেশ। অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। সেইসমস্ত মুহূর্তগুলি চোখের সামনে ফিরে আসছে, ওর সঙ্গে যাপন করা মুহূর্তগুলি। ডা. দাস বলেও দিয়েছিলেন, "প্রথমদিকে খুব কষ্ট হবে। কিন্তু দিনদশেক পরে দেখবেন সমস্যা অনেক কমে গেছে। নিজে-নিজে এমনভাবে বলবেন যেন শব্দগুলো আপনার মুখ থেকেই আপনার কানে ঢোকে। পনেরো দিন বেশি একমাস এটা অভ্যাস করতে পারলে দেখবেন ওই পার্টিকুলার শব্দগুলো অন্য কারও মুখ থেকে আপনার কানে ঢুকলেও আপনি আর ততটা রিঅ্যাক্ট করছেন না।"

একমাস দূরে থাক, তিনদিনও ওই অনুশীলন চালাতে পারলেন না অখিলেশ। শব্দগুলো বললেই ওই শ্বাসরোধকারী অবস্থাটা ফিরে আসছে। ও যখন সঙ্গে ছিল, তার সমস্ত সময়টা জলস্রোতের মতো বয়ে আসছে অখিলেশের উপর। এরপরেও অখিলেশ চেষ্টা করে গেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন অখিলেশ, এই কাজটা তিনি করে উঠতে পারবেন না।

অখিলেশদের বাড়িতে দু'টি ছোট-ছোট বারান্দা আছে। পিছনের বারান্দায় রাখাশি মেশিন রাখা। আর সামনের বারান্দায় শেল্‌ফ করে বইপত্র, খবরের কাগজ, পত্রিকা। সামনের বারান্দায় এখন আর যেতে পারেন না অখিলেশ। কারণ, অখিলেশদের বাড়িতে সব জায়গায় সমানভাবে মোবাইল ফোনের টাওয়ার পাওয়া যায় না। ঘরের ভিতরে ফোন ধরলে কথা ভেঙে-ভেঙে যায়, অস্পষ্ট শোনায়। তাই সামনের বারান্দায় গিয়ে কথা বলতে হয়। ওখানে স্পষ্ট শোনা যায়। প্রায় সবসময়ই ওর ফোন এলে বা ওকে ফোন করতে হলে সামনের বারান্দায় চলে যেতেন অখিলেশ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলে নিতেন।

একদিন সকালে একটি ফোন এসেছে অখিলেশের কাছে, ফোন নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বারান্দায় চলে এসেছেন অখিলেশ। হঠাৎ থমকে গেলেন। অখিলেশ দেখতে পেলেন বারান্দায়, বারান্দার সামনের রাস্তায়, পাশের বাড়ির দেওয়ালে, পাঁচিলে, বারান্দার অদূরে গাছপালায়— ঠিক সেইরকম রোদ্দুর পড়েছে, যেরকম রোদ্দুর অখিলেশ দেখতে পেতেন ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময়ে। সমস্ত কিছু অবিকল একরকম আছে, শুধু ও ছেড়ে চলে গেছে অখিলেশকে। ডা. দাস বলেছিলেন, "সব মানুষ তো সমান সেনসিটিভ হয় না। উনি যদি সেনসিটিভ হতেন, ন'বছর আপনার সঙ্গে মেলামেশা করার পর, আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য ঠিক এই রাস্তাটাই হয়তো নিতেন না। উনি বুঝেছিলেন আপনি সাংঘাতিক আঘাত পাবেন, কিন্তু উনি ভিতর থেকে কোনও বাধা পাননি সেকথা ভেবে। ওর কাছে ওঁর সেই মুহূর্তের ইচ্ছেটাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ছিল।"

সকালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অখিলেশ কথা বলছেন একজন লেখকের সঙ্গে। তাঁর সামনে, চারদিকে সকালের রোদ্দুর। ওই রোদ্দুরে স্নিগ্ধ সকালের গাছপালা, আসলে গোটা সকালটাই আর সহ্য করতে পারছেন না অখিলেশ। কোনওমতে কথা শেষ করে বারান্দাভরা সকালবেলাটি থেকে পালিয়ে বাঁচলেন অখিলেশ।

অখিলেশ শুধু রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে পালাতে পারেন না। অখিলেশ একজন লেখক। বিভিন্ন আলোচনাচক্রে এবং বিভিন্ন সভায় যেতে হয় তাঁকে। অখিলেশ সভাসমিতি যথাসম্ভব এড়িয়েই থাকেন, তবুও কোথাও-কোথাও যেতেই হয়। আলোচনাসভায় প্রায় প্রত্যেক বক্তাই 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দটি অন্তত একবার উচ্চারণ করবেনই করবেন। শোনামাত্রই অখিলেশের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। ওর উচ্চারণে কতবার রবীন্দ্রনাথ কথাটা শুনেছেন! অখিলেশের প্রিয় লেখক শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধ পড়তে ভালবাসেন অখিলেশ। ভালবাসেন বুদ্ধদেব বসুর গদ্যরচনা। ডা. দাস বারবার বলে দিয়েছেন, "নিজেকে এনগেজড রাখবেন, লিখতে না পারলে বই পড়বেন।" অখিলেশ বলেছিলেন, "বই পড়তেও পারছি না।" ডা. দাস তখন বলেন, "বই হাতে নিয়ে বসে থাকবেন। একপৃষ্ঠা, দু'পৃষ্ঠা করে চেষ্টা করবেন। পড়ার চেষ্টা। পড়তে একবার শুরু করলে দেখবেন মাথা আর ঝুঁকে-ঝুঁকে হাঁটু পর্যন্ত যাচ্ছে না। মাথা ঝুঁকে যাওয়া বন্ধ হয়ে আসবে, অন্তত কমে আসবে। বই পড়ার চেষ্টা ছাড়বেন না।"

অখিলেশ চেষ্টা ছাড়েননি। কিন্তু তাঁর প্রিয় দুই লেখক শঙ্খ ঘোষ আর বুদ্ধদেব বসু, এঁরা দু'জনেই বারবার আহত করছেন অখিলেশকে। কেননা, ওঁদের দু'জনের গদ্যরচনায় থেকে-থেকেই 'রবীন্দ্রনাথ' কথাটি ভেসে উঠছে। বাধ্য হয়ে শঙ্খ ঘোষ এবং বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ থেকেও পালিয়ে যেতে হল অখিলেশকে। অখিলেশ ভেবেছিলেন, প্রিয় কিছু লেখা, যা একসময় খুব ভাল লেগেছিল, আবার নতুন করে পড়লে হয়তো মনের ক্ষতের উপর প্রলেপ পড়বে। কিন্তু ফিরে পড়তে গিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দটি এমন একজনের স্মৃতি ফেরত আনতে লাগল, যা কেবল কষ্টই বাড়িয়ে দিল অখিলেশের। অখিলেশ বুঝলেন, তিনি সাহিত্যের একটু বাইরে চলে এসেছেন। সাহিত্য উপভোগের শক্তি আর তাঁর নেই। 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দটিতে অখিলেশ যে বারবার আহত হচ্ছেন, তার সঙ্গে সাহিত্যের কোনও কারণ জড়িত নয়। ও জড়িত।

অখিলেশ বুঝতে পারলেন, মনের দিক দিয়ে কতদূর নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন তিনি!

অখিলেশ মাছ-মাংস খেতে পারেন না। ডিমও নয়, দুধও না। অখিলেশ সেদ্ধ ভাত খান। সুরমাই খেতে দেন অখিলেশকে। সুরমা অখিলেশের জন্য যত্ন করে রান্না করেন রোজ। অখিলেশ খাওয়া শেষ করে গেলে, তখন সুরমা বলে যেতে থাকেন, "আমার পোড়া মাংস খাচ্ছ, আমার শরীরপোড়া মাংস... সবসময় তো মরে যাচ্ছ একজন পরমহিলার জন্য... তোমার শোক তো দিন-দিন বাড়ছে..."

একটানা এমন বলে যান। খেতে-খেতে অখিলেশের চোখে জল আসে। কিন্তু অখিলেশের কান্নার স্বাধীনতা নেই। অখিলেশের চোখে জল এসেছে, যদি একবার দেখে ফেলেন সুরমা, তা হলে আক্রমণ আরও বেড়ে যাবে। অভিসম্পাত মাখা অন্ন রোজ গ্রহণ করেন অখিলেশ মুখ বুজে। একদিন চোখের জল লুকিয়ে ভাত খেতে-খেতে অখিলেশের মনে হল ওঁর সঙ্গে গত ন'বছর যত সুন্দর মুহূর্তের শরিক হয়েছিলেন অখিলেশ, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা, অপমান আর অভিসম্পাতের স্রোতে তা সমস্তই ভেসে চলে গেছে। পড়ে আছে বুকভরা হাহাকার।

সুরমাকে অখিলেশ এখনও ভালবাসেন। কিন্তু এখনও ভালবাসেন কথাটা হয়তো আর ততটা সত্যি নয় অখিলেশের ক্ষেত্রে। ভালবাসার যা কিছু অনুভূতি সমস্তই পুড়ে ঝলসে গেছে। পাঁজরের মধ্যে-মধ্যে শুধু কয়েক খণ্ড অঙ্গার ধিকিধিকি করে জ্বলছে সবসময়। সুরমার কঠোর ভাষা, টুকুনের ঠান্ডা, তীক্ষ্ণ তিরস্কার এখন শুধু সত্য অখিলেশের জীবনে।

ও অখিলেশকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই সেই বিচ্ছেদের তীব্র আঘাতে অখিলেশ একগুচ্ছ কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাগুচ্ছ এবার প্রকাশিত হল সেই পাক্ষিক পত্রিকাটিতেই। সে পত্রিকা হাতে নিয়ে সুরমা বললেন, "এখনও ওকে নিয়ে লিখে যাচ্ছ? বললাম তো, আমার পোড়া মাংস যতদিন না তুমি দেখবে, তোমার ওই শোক যাবে না।"

বলতে-বলতে ছুটে গিয়ে সুরমা দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলেন

আবার। সুরমার ওই উন্মত্ত হয়ে ওঠাকে খুবই ভয় পান অখিলেশ। প্রাণপণ চেষ্টায় সুরমাকে দেওয়ালের কাছ থেকে সরিয়ে আনতে গিয়ে অখিলেশ খাটের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। সুরমা কাঁদতে-কাঁদতে কক্ষ ত্যাগ করলেন। খাটের উপর বসে অখিলেশ ভাবতে লাগলেন, কী ভয়ানক এক অগ্নিকুণ্ডের ভিতর অখিলেশকে ঠেলে দিয়ে গেল ও।

কুড়ি

সুরমা আর সুরমার বন্ধু সেই লেখিকা, দু'জনে একটি ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলেন নন্দনে, এক শনিবার সন্ধেবেলা। রাতে ফিরে এসে সুরমা জানালেন, "আজ তোমার প্রেমিকাকে দেখলাম।"

অখিলেশ চুপ করে রইলেন।

সুরমা বলে চললেন, "তোমার প্রেমিকা এই ছবিটিই দেখতে গিয়েছিল। সঙ্গে আমাদের সেই উকিল। আমি দেখলাম দু'জনে একসঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে। হলে ঢুকে পাশাপাশি বসলও দু'জনে।"

অখিলেশের মুখে কোনও কথা নেই। অখিলেশ তো অনেকদিনই মনে-মনে জানেন ওই কুৎসিত এক নতুন প্রেমিক। স্পষ্ট ও চাক্ষুষ একটা প্রমাণের কথা এখন শুনছেন শুধু।

ফিল্ম শেষ হওয়ার পর হলে আলো জ্বলে উঠলে উকিলকে ডেকে কথাও বলেছেন সুরমা। উকিল পায়ে-পায়ে ভিড় ঠেলে যতক্ষণে সুরমার কাছাকাছি পৌঁছেছেন, তার অনেক আগেই নন্দনের অন্যদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে ও। দু'জনে একসঙ্গে সুরমার সামনে আসেনি। সুরমার বিবরণে জানা গেল, উকিল নাকি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন সুরমার সামনে এসে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "অখিলেশবাবু কেমন আছেন?" সুরমা নাকি জবাব দেন, "যেমন থাকার তেমনই আছে।"

সঙ্গে সুরমা এও বলেন, "তবে আপনি তো দেখছি বহাল তবিয়তেই আছেন।" সেকথা শুনে উকিলের সর্বদা দর্পিত মুখ নাকি অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। উকিল বলেন, "একদম তো সময় পাই না। আজকে এই সিনেমাটা একটু দেখতে এলাম।"

তারপর কোনও বিষয়বাক্য উচ্চারণ না করেই উকিল পিছনে ঘুরে ভিড়ের ভিতর ঢুকে যান।

সুরমা বলেন, "তোমাকে বলেছিলাম না ও মহা আনন্দে আছে! তুমিই শুধু ওর জন্য দুঃখে মরে যাচ্ছ। মরো, আরও মরো। দগ্ধে-দগ্ধে মরো। যত দগ্ধাবে তত বুঝবে কত বড় পাপ করেছ। এত সহজে তুমি নিস্তার পাবে না।"

অখিলেশ শুতে যাওয়ার আগে ভাবলেন, আজকে নিয়ে তিনশো বাইশ দিন হল। দিন গুনে যাওয়াটা অখিলেশ কিছুতেই বন্ধ করতে পারছেন না। ঘুমের ওষুধগুলো খেয়ে নিলেন অখিলেশ। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া দরকার আজ। সত্যিই খুব আনন্দে আছে ও। কিন্তু ওর কথা চিন্তা করা থামিয়ে দিতে হবে। কী করে থামাবেন, অখিলেশ জানেন না। ডা. দাস বলেছেন যতদূর সম্ভব কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে সবসময়। সেই কথা মান্য করে এখন অখিলেশ, এমনকী সভাসমিতিও এড়িয়ে চলছেন না। পরের দিন বিকেলে দিল্লি যাওয়ার বিমান ধরতে হবে অখিলেশকে। ব্যাগ গোছাতে হবে সকালে। দিল্লিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে কয়েকজন কবি ও লেখক এসে মিলিত হবেন এক ছোট সমাবেশে। সেখানে অখিলেশেরও আমন্ত্রণ আছে।

ঘুমোবার আগে যে-ভয় এবং যে কষ্ট প্রত্যেকদিন আক্রমণ করে, তারা আজ আরও বেশি করে ঘিরে ধরল অখিলেশকে। এক্সপার্টের গর্বোদ্ধত মুখ ফিরে-ফিরে আসতে লাগল চোখের সামনে। তার পাশাপাশি ভেসে উঠতে লাগল ওর দীপ্ত দুই আখিতারা। টানা-টানা চোখের তলায় হালকা কাজলরেখা। পেনসিল দিয়ে কপালের উপর উড়ে পড়া চুল সরানো। সুরমা ঠিকই বলেছেন। অখিলেশ নিস্তার পাবেন না। এই দৃশ্যগুলি অখিলেশকে তাড়া করে যাবে। ভাগ্যিস সুরমা জানেন না কী কী দৃশ্য অখিলেশকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আবার অখিলেশের মনে পড়ল সেই পুরনো কথা, "আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?" নিশ্চিতভাবে একথা ও এখন এক্সপার্টকে বলে। ঘুমের হাতে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য অখিলেশ প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

একুশ

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ টেবিলে বসেছেন অখিলেশ। রোজ সকালে এইখানে বসে সুরমা-অখিলেশ চা খান। চা খাওয়া হলে এখন ব্যাগ গোছাতে হবে। বিকেলে দিল্লি যাওয়া আছে। এই মুহূর্তে সুরমা সামনে নেই। বারান্দায় গিয়ে একটা ফোনে কথা বলছেন।

কথা শেষ করে সুরমা ঘরে এলেন। অখিলেশের উলটোদিকের চেয়ারে বসলেন। টেবিল থেকে চায়ের কেটলি তুলে চা ঢাললেন নিজের কাপে। বললেন, "এখন একটা কথা বলব। শুনে হার্টফেল কোরো না। তোমার প্রেমিকার একটি মেয়ে হয়েছে, দেড় মাস আগে।" অখিলেশ নিস্তব্ধ রইলেন।

সুরমা বলে চললেন, "শীলাদি ফোন করেছিল। শীলাদির সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। শীলাদির কাছে একজন আয়ার খোঁজ করছে। রাতদিনের আয়া।"

অখিলেশ এখনও চুপ।

সুরমা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "এখন আছে কোন্নগরে, মায়ের কাছে। ওখানেই তিনমাস থাকবে। তারপর বাচ্চাকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে যাবে। তখন রাতদিনের আয়া দরকার হবে। শীলাদি সেটাই বলল।"

অখিলেশ অবশেষে বললেন, "আমার সুটকেস গোছাতে হবে। যাই স্নান করে আসি।"

অখিলেশ বিকেলের বিমান ধরে দিল্লিতে এলেন। তার পরের দু'দিন ধরে চলল লেখকদের সমাবেশ। আর্জেন্টিনা থেকে একজন লেখক এসেছেন। চিন দেশ থেকে এসেছেন একজন কবি। মরক্কো থেকে এসেছেন আরবের আর-একজন কবি। তাইওয়ান থেকে একজন। ভারতে থাকেন আর ইংরেজি ভাষায় লেখেন এরকম লেখক আছেন দু'জন। হিন্দি ভাষার কবি একজন। বাংলা ভাষা থেকে অখিলেশ।

দু'দিন সন্ধ্যায় কবি-লেখকরা তাঁদের রচনা পাঠ করলেন। সকলের সঙ্গেই আছে তাঁদের লেখার ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদকরাও এসেছেন কেউ-কেউ। সন্ধ্যাবেলার কবিতা ও গদ্যরচনা পাঠ যেমন হয়ে থাকে তেমনই হল। কিন্তু এই দু'দিনই সকালের ঘরোয়া বৈঠক হল সম্পূর্ণ অন্যরকমের।

বড় হলঘরে বিরাট এক টেবিলের দু'ধারে বসলেন কবি-লেখকরা। তাঁদের সবার সামনে একটি করে ছোট মাইক্রোফোন রাখা, সুইচ টিপলেই যে-মাইক্রোফোন সচল হয়ে উঠবে। সকলেই কথা বলতে পারবেন।

তাঁরা কথা বললেনও। কী নিয়ে কথা বললেন তাঁরা?

তাঁরা কথা বললেন 'সাইলেন্স' নিয়ে। আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল নৈঃশব্দ্য। শব্দকে লেখায় প্রয়োগ করা যাঁদের কাজ, তাঁরা কে কীরকমভাবে সাইলেন্সের মুখোমুখি হন, কীভাবে তাকে ব্যবহার করেন, কোন লেখকের জীবনে 'সাইলেন্স'-এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি—এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হল। কথার পর কথা হল।

আরও একটা জরুরি বিষয় উঠে এল আলোচনায়। আনসেড অ্যান্ড আনসেয়েব্‌ল্ যা, তাকে নিয়ে কী করবেন লেখক। এক-একজনের কাছে এক-এক জিনিস আনসেয়েব্‌ল্। এক-একজনের দৃষ্টিভঙ্গি এক-একরকম। কে কীভাবে দেখবে তার আনসেয়েব্‌ল্ বিষয়বস্তুকে? অখিলেশের ভিতরে তখন দাউদাউ করে জ্বলছে অখিলেশের আনসেয়েব্‌ল্। এখানেও মুখ বুজে থাকলেন অখিলেশ।

দু'দিনের আলোচনাচক্র শেষ হল। এই দু'দিন হোটেলের বিছানায় শুয়ে পুরো রাত্রি জেগে থেকেছেন অখিলেশ। ডা. দাসের কথা অক্ষরে-

অন্ধারে মান্য করে কর্মব্যস্ত থেকেছেন অখিলেশ সারা দিন, সারা সন্ধ্যে। কিন্তু একটুও ঘুম হয়নি তাঁর।

অখিলেশ মর্মে-মর্মে বুঝেছেন এক্সপার্টের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছেন তিনি। যদিও অখিলেশ এক্সপার্টের সঙ্গে কোনওদিনই লড়তে যাননি, তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ের কল্পনাও করেননি কখনও, কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, অখিলেশ হেরে ভূত হয়ে গিয়েছেন।

এক্সপার্টের সন্তানকে ও গর্ভে ধারণ করেছে, এক্সপার্টের সন্তানকে জন্ম দিয়েছে। একজন 'সিঙ্গল মাদার' হিসেবে সমাজের সমস্ত বিরুদ্ধতার সামনে মাথা তুলে বাঁচবার সংকল্প গ্রহণ করেছে। যে-মেয়ে কেবলই অখিলেশের সামনে বলে গেছে "আমি একজন ব্যর্থ নারী", বলে গেছে, "আমার জীবন চূড়ান্ত অসফল"— সেই মেয়েকে কতখানি মানসিক শক্তি দিতে পেরেছেন এক্সপার্ট, যার ফলে সে 'একক জননী' রূপে আজ নিজের পরিচয় দিতে ভয় পায় না! কতটা সাহস সে-মেয়ের মধ্যে সঞ্চার করতে পেরেছেন এক্সপার্ট!

এ-কথা চিন্তা করার সঙ্গে-সঙ্গে অখিলেশ এটাও উপলব্ধি করেন যে, নিজের শরীরকে সম্পূর্ণভাবে উপহার দিয়েছে ও এক্সপার্টকে। যে-সম্পর্ক একদিনের জন্যও ওর সঙ্গে হয়নি অখিলেশের।

ঈর্ষার বিষে আর ঈনমন্যতায় দগ্ধ হতে থাকেন অখিলেশ। রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে বয়ে আসা স্পর্শের অতীত আর শারীরিকতার ঊর্ধ্বে একটি স্বপ্নপ্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ও অখিলেশের জীবনে। ওর হাতের আঙুলটুকুও কখনও ছুঁয়ে দেখেননি অখিলেশ।

একটা অসম্ভব যাতনা অখিলেশকে তাড়া করতে লাগল। আলোচনাচক্রে আর কবিতাপাঠে অংশ নেওয়ার সময়েও ওই ভয়ানক বিষ হু-হু করে জ্বলেছে অখিলেশের মস্তিষ্কে। অখিলেশ কেবলই ভেবে চলেছেন, আমি একদিনের জন্যও ওকে ছুঁইনি, স্পর্শ করার কথা ভাবিনি কখনও— আর ও? ও যার কাছে গেল, তাকে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে দিল। ওই শরীর সমর্পণ করার উচ্ছ্বাসভরা তৃপ্ত আনন্দই ফুটে বেরিয়েছে ফেসবুকে। ওর গোপালপুর ভ্রমণের ছবিগুলোয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ওই ছবির মধ্যে কোনওখানে ও এক্সপার্টের কোনও ছবি রাখেনি। সুরমা অখিলেশকে ছবিগুলো দেখিয়েছিলেন। ওরা দু'জনে যে গোপালপুর ভ্রমণে গিয়েছিল, সে বিষয়ে অখিলেশ নিশ্চিত।

এক অসম্ভব বিষজ্বালা অখিলেশের সমস্ত অস্তিত্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও অখিলেশ একজন মানুষ হিসেবে ওর প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধাও অনুভব করছেন। একটি বিরল সম্ভ্রমবোধ অখিলেশের ভিতরে জাগ্রত হয়ে উঠছে, এতখানি রূপাস্থর একজন নারীর জীবনে ঘটল যে, সে 'সিঙ্গল মাদার' হিসেবে নিজ প্রেমিকের সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হতে দিল।

একদিকে পুরুষ হিসেবে নিজের চরম পরাভব, ব্যর্থতার নিদারুণ গ্লানি, অন্য পুরুষের কাছে সমূলে হেরে যাওয়া— অন্যদিকে ওই বিবাহিত প্রেমিক ও তাঁর অবৈধ প্রেমিকার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা বিচলিত করে তুলল অখিলেশকে। অখিলেশের কাছে যখন ও এসেছিল, অখিলেশ বিবাহিত জেনেই এসেছিল। এক্সপার্টের কাছে যখন ও গেছে, এক্সপার্ট বিবাহিত জেনেই গেছে। কিন্তু বিবাহিত প্রেমিকের সন্তান যখন গর্ভে এল, তখন এক পা-ও পিছিয়ে যায়নি। যাকে শরীর দিয়েছে, তাকে সন্তানও দিল। না, ওরা কোথাও হেরে যায়নি। অখিলেশের যত কষ্টই হোক না কেন, অখিলেশ এ-কথা মানতে প্রস্তুত যে, ও প্রকৃতই একজন শ্রদ্ধাযোগ্য নারী। অখিলেশ যাকে চিনতেন, এ নারী সে নয়। এ একজন অন্য রমণী, যার সাহসকে কুর্নিশ জানাতে হয়।

অখিলেশের অনুমান, বুদ্ধপূর্ণিমার দিন গর্ভে এসেছিল এই কন্যা। বুদ্ধপূর্ণিমায় সারাদিন ও ফোন ধরেনি। অখিলেশ বারবার ফোন করায় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় মেসেজ করেছিল, "I am ok. Call you later." কিন্তু পরেও ফোন করেনি। রাত ন'টা চল্লিশে অখিলেশ ফোন করার পর বলে, "এক্সপার্ট ডেকেছিলেন। জরুরি তলব।"

অখিলেশের ধারণা, বুদ্ধপূর্ণিমার দিন ওর ফ্ল্যাটে দু'জনের দেখা হয়। ওরা নির্জন হতে পারে সেখানে। সেদিনই সংযোগ ঘটে দু'জনের। ঠিক তার পরদিনই ও অখিলেশকে বলে, "ডোন্ট গেট হার্ট। আই অ্যাম ইন আ রিলেশনশিপ।" বুদ্ধপূর্ণিমার পরের দিনই ও অখিলেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে চলে যায়।

দিল্লি থেকে বিমানে উঠেছেন অখিলেশ, কলকাতা ফিরবেন। বিমান তখনও ছাড়েনি। অখিলেশের সিটের পিছন দিক থেকে ভেসে এল একটি শিশুর কান্না। কান্নার শব্দ শুনে অখিলেশ ঘুরে তাকালেন। ঠিক তাঁর পাশের সারির একটু পিছনে প্রথম সিটে বসে আছে একটি তরুণী মা। কোলে ধরা বাচ্চাটির বয়স বড়জোর মাস ছয়েক। এই বাচ্চাটিই কাঁদছে। অখিলেশের মনে হল ডা. দাসের কাছে এবার যখন যাবেন, তখন বলতে হবে, পথে-ঘাটে সদ্যোজাত শিশু দেখলে, অথবা তাদের কান্না শুনলে অখিলেশের ভিতরকার দুর্বোধ্য কষ্টটা বেড়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে শিশুর কান্না অখিলেশ জীবনে অনেক শুনেছেন। কিন্তু ও সন্তানবতী হয়েছে সে-খবর জানার পর শিশুর ক্রন্দনধ্বনি এই প্রথম শুনলেন। শোনামাত্র অখিলেশের মনে ফিরে এল ও। অখিলেশের মনে হল ওর শিশুটিও কি এখন কেঁদে উঠল?

বাইশ

রাতে বাড়ি ফিরে এসেছেন অখিলেশ। এক কাপ চা তৈরি করে নিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসেছেন। এইসময় টুকুন এসে বসল অখিলেশের ঠিক সামনের সোফায়। খুব শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে বলল, "উইল ইউ নাও প্লিজ দ্য টুথ?"

অখিলেশ টুকুনের কথা বলার এই ভঙ্গির সঙ্গে ইদানীং বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ভঙ্গিটি তাঁকে অবাক করল না। কিন্তু অখিলেশ টুকুনের প্রশ্নটি একেবারেই বুঝতে পারলেন না। বললেন, "মানে?"

টুকুন বলল, "বাচ্চাটা কার? তোমার তো?"

অখিলেশ বজ্রাহত হলেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন, "এ তুমি কী বলছ বাবা? এ কখনও হতে পারে?"

অখিলেশের মনে হল কথাটুকু বলতে গিয়ে তাঁর গলা দিয়ে যেন আওয়াজই বেরোচ্ছে না।

সুরমা ও ঘর থেকে চলে এলেন। বললেন, "তুই আবার জিজ্ঞেস করছিস কিসের জন্য? বাচ্চাটা ওর। খবরটা শুনে মুখ কীরকম ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল যদি দেখতিস।"

টুকুন একইরকম শান্ত আর তীব্র স্বরে বলে, "ওকে, নাও কনফেস। কনফেস ক্লিয়ারলি। আর ইউ দ্য ফাদার অফ দ্যাট বেবি?"

সুরমা বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরই মেয়ে। ওরই।"

অখিলেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তাঁর কোনও উত্তরই এরা আর বিশ্বাস করবে না। অখিলেশ এমন একজন মানুষ, সারাজীবন যে 'বাবা' ডাক শুনতে চেয়েছে, কিন্তু নিজের কোনও সন্তান পৃথিবীতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। সেই অখিলেশকে কাঁধ জীবন একটি সন্তানের পিতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে, অপরাধী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, কিন্তু সে-শিশুর জননীকে অখিলেশ কখনও স্পর্শ করেননি।

অখিলেশের গোপন পিতৃত্ব নিয়ে মা-মেয়ের আলোচনা চলেছে। আলোচনারত মা-মেয়ে অখিলেশের সামনে থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে যাচ্ছে।

অখিলেশ চায়ের কাপ পাশে নামিয়ে রাখলেন। অখিলেশের মাথা তাঁর নিজের হাঁটুর দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইছে। নিজেকে সোজা রাখলেন অখিলেশ। সোজা। সব তির, সব বল্লম অখিলেশকে ফুঁড়ে যাক। অখিলেশ নিজের মাথাকে হাঁটুর দিকে আর ঝুঁকে পড়তে দেবেন না। অখিলেশের প্রেম জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে এখন। তবু ওই নারীকে, অবিবাহিতা ওই জননীকে অখিলেশের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না কিছুতেই। আজীবন মর্মান্তিক এক ব্যথার সঙ্গে-সঙ্গে ওর প্রতি গভীর একটি শ্রদ্ধাকেও বহন করে চলবেন তিনি।

অঙ্কন: সৌরীশ মিত্র